আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চিন্তা ও দুশ্চিন্তা

হাসনান আহমেদ

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা–চিন্তা ও দুশ্চিন্তা
হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

হাসনান আহমেদ-এর লেখা 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা' বইটি পড়লাম। মনে হয়েছে শিক্ষা নিয়ে লেখক খুব অস্থিরতার মধ্যে আছেন– অস্থিরতা রয়েছে বর্তমান শিক্ষা ও মূল্যবোধের সম্পর্ক নিয়ে, শিক্ষাব্যবস্থা ও কার্যকারিতার সম্পর্ক নিয়ে, পুরো শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। তিনি বর্তমান ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েও অনেকাংশে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর লেখায় তা ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। আবেগ দিয়ে লিখেছেন। দ্বিমত করার সুযোগ খুব নাই। তিনি শুধু সমস্যার কথাই বলেননি, একটি শিক্ষা-কাঠামো প্রস্তাব করেছেন 'শিক্ষায় সাত আর'-এর উপর ভিত্তি করে। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে গুরুত্ব সহকারে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় এবং সুষ্ঠুভাবে করা যায়, তা তিনি তাঁর কাঠামোতে দেখিয়েছেন। এটা করার পিছনে রয়েছে মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে শিক্ষা ও সমতাভিত্তিক সমাজ এবং উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক। উন্নত মানবসম্পদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বইটি নিয়ে অনেক আলোচনার সুযোগ রয়েছে। আশা করি নীতিনির্ধারক এবং সচেতন ব্যক্তিদের কাছে বইটি সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক ড. এম. এ. বাকী খলীলী
ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক অধ্যাপক, ফিন্যান্স বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ লিখিত 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা' শীর্ষক বইটি পড়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার গভীর ক্ষতগুলোর অকপট বর্ণনা খুঁজে পেলাম। শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের উপলব্ধি আমার বহুদিনের; কিন্তু কোনোদিন তা লেখা বা প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বইটি পড়ে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আমার সে চিন্তাভাবনায় অনেক কিছু সংযোজন করতে পেরেছি। বইটিতে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত, তার কার্যকারিতা ও সংস্কারের দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপরেখা আছে। শিক্ষার আবশ্যকীয় উপাদান তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে মৌলিকভাবে দুর্বল করে তুলছে, নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজব্যবস্থা তৈরিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে, তার প্রাঞ্জল ও বাস্তবভিত্তিক বর্ণনা বইটিতে আছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও পরিবারকেন্দ্রিক শিক্ষা একটি আদর্শ সমাজ তৈরি করতে পারে, যেখানে অনৈতিকতা স্থান করে নিতে পারে না। তাই সংস্কারের শুরুটা প্রাথমিক স্তর থেকেই হওয়া দরকার। মাধ্যমিক ও উচ্চ-শিক্ষায় বেশ কিছু পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারে এবং একটি সমৃদ্ধ ও প্রাগ্রসর দেশ গড়ে তুলতে পারে। সেজন্য ড. আহমেদের প্রস্তাবনা ও অভিমুখ সময়োচিত। আমি আশা করি বইটির প্রস্তাবনা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে গভীর ভূমিকা রাখবে।

ড. মো. সাদিকুল ইসলাম
অধ্যাপক, ফিন্যান্স বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

লেখকের অন্যান্য বই:

জীবনক্ষুধা (কবিতা)
প্রতিদান চাইনি (উপন্যাস)
কিছু কথা কিছু গান (ছোটগল্প)
অপেক্ষা (উপন্যাস)
শেষবিকেলের পথরেখা (উপন্যাস)
সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম (প্রবন্ধ)
সত্যের গল্প গল্পের সত্য (ছোটগল্প)
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা – চিন্তা ও দুশ্চিন্তা (প্রবন্ধ)
নৈঃশব্দ্যের কথকতা (উপন্যাস)
এইসব দিনকাল (ছোটগল্প)
এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে (প্রবন্ধ)
অলখ মহাশক্তির খেলাঘর (প্রবন্ধ)

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা
চিন্তা ও দুশ্চিন্তা

হাসনান আহমেদ

নবৃত্তি

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০২১
পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ, আগষ্ট ২০২৪

প্রকাশক
প্রকৃতি
১১৪-১৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.books@gmail.com

প্রচ্ছদ
রাকিবুল ইসলাম

অলংকরণ ও কম্পোজ
মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল)

মুদ্রণ
লিংক ভিশন
মিরপুর, ঢাকা
linkvision.bd@gmail.com

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯১৪৮৬-১-৭

মূল্য: ২০০.০০ টাকা

Amader Shikshabyabostha- Chinta O Dushchinta
By Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, August, 2024
Price: Tk. 200.00

উৎসর্গ

সোদরপ্রতিম প্রয়াত-সহকর্মী
অধ্যাপক ড. গিয়াস উদ্দীন আহমেদ
(অর্থনীতি)
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার কথা

এ দেশের সমাজব্যবস্থার পথ ধরে জীবনের বাস্তবতায় চলতে গিয়ে এবং দীর্ঘ বছর শিক্ষকতা পেশায় কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত নানারকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই, অসহনীয় ভোগান্তির মধ্যে দিনাতিপাত করি। গণমাধ্যমের কৃপায় নানা কথা পড়ি, শুনি, কখনো ছবিসহ দেখি। নির্বোধ না-হওয়ার কারণে কিংবা পেশাগত সচেতনতার কারণে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলে আসে।

এ বিপুল জনগোষ্ঠীর একটা সামান্য অংশ অভিভাবক ও নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষার আলো পেলেই পুরো জনগোষ্ঠী শিক্ষিত হয়ে গেল বলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলার কোনো অবকাশ নেই। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বর্তমান মুখ-থুবড়ে-পড়া শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা এবং বিদ্যমান শিক্ষাহীনতার দুরবস্থা থেকেই আমার এই শিক্ষা-বিষয়ক ভাবনা। শিক্ষার মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও মানবসম্পদে পরিণত করা ছাড়া জাতি ও সমাজের উন্নতির আর কোনো বিকল্প আমার জানা নেই।

আমি নিজের ভাষায় বর্তমান সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছি; কী করণীয় সে বিষয়ে যথাসম্ভব আলোকপাত করেছি আমার অভ্যাসগত ভঙ্গিতে। এটাই সব– এ কথা বলবো না। তবে এ দেশের শিক্ষা-সচেতন ও দেশ-সচেতন সমাজ শিক্ষার এ অচলায়তন ও অধোগতি থেকে দেশকে বের করে আনার জন্য বিষয়টাকে একটা সামাজিক আন্দোলনে রূপ না দিলে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। দেশ ও জাতির অগ্রগতির স্বার্থে এ কাজ জরুরি। নইলে সামনের পথ ক্রমশই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

আমার এ প্রস্তাবনা 'সকল রোগের মহৌষধ'– এমন দাবি করিনে। তবে কোথাও-না-কোথাও থেকে শুরু তো একবার করতে হবে। আমি চিন্তাভাবনার শুরুর কাজটা করে দিলাম মাত্র। আমার এ ভাবনাকে টেরা চোখে না দেখে সংশ্লিষ্ট পক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হবে– এটাই আমার আশা।

আমার এ জীবদ্দশায় শিক্ষা, শিক্ষাঙ্গন ও অধঃপতিত সমাজের উন্নতির শুরুটা দেখে যেতে পারলেও শান্তি। সব ভালো তার, শেষ ভালো যার।

ঢাকা, মে ২০২১ (হাসনান আহমেদ)

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ বিষয়ে আমার কথা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আমার চিন্তা ও দুশ্চিন্তা উভয়ই বইটা লেখার সময় ও প্রথম প্রকাশের সময় ছিল, এখনোও আছে; এখন বরং আরো বেড়েছে। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সবসময় বই লিখতে কাজে লাগাই। প্রথম প্রকাশের পর এ বিষয়ে একটা গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়। তাতে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারী অনেক শিক্ষাবিদ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদেরও এ বিষয়ে চিন্তা ও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এতে আমি বিষয়টা নিয়ে ভাবার আরো প্রেরণা পাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম প্রকাশের বই ফুরিয়ে যায়, যা আমাকে দ্বিতীয় প্রকাশে বাধ্য করে। দ্বিতীয় প্রকাশে আমি 'উন্নয়ন মডেল'কে পরিবর্ধিত করি। এছাড়া 'শিক্ষাপদ্ধতি' ও 'শিক্ষার অভিমুখিতা' বিষয়ে দুটো অধ্যায় সংযুক্ত করি এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের সুচিন্তিত মতামত আলাদাভাবে বইয়ের শেষাংশে যথাসম্ভব সন্নিবেশিত করি। অন্যান্য অধ্যায়ও যতটুকু পারা যায় সংশোধিত করি।

সময়ের পরিবর্তনে দেশে যতই নতুন নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করা হোক না কেন, মূল্যায়ন পদ্ধতির অভিনবত্ব দেখানো হোক না কেন, এতে আমি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আশান্বিত ও নিশ্চিন্ত হতে পারি না। প্রবর্তিত পদ্ধতির সাথে বাস্তবতার অনেক ফারাক চোখে ধরা পড়ে। এভাবে তো তেপ্পান্ন বছর আমরা পার করে ফেলেছি; আর কত! টেক্সটসহ শিক্ষাপদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতির অনেককিছুতেই আমার দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ থেকে যায়। অবশেষে নিজেই কলম ধরি। আশা করি বিদগ্ধ পাঠকসমাজ আমার এ চিন্তা ও দুশ্চিন্তার কারণ সম্যক বিশ্লেষণ করে বুঝতে সমর্থ হবেন এবং দেখানো পথের স্বীকৃতি দেবেন।

ঢাকা, জুলাই ২০২৪

(হাসনান আহমেদ)

অভিমত

প্রফেসর ড. হাসনান আহমেদের লেখা 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা' শীর্ষক বইটি আমি পড়েছি। আজ সমাজজীবনের সব ক্ষেত্রেই যে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার প্রতি একটা গভীর খেদ ও দুঃখ থেকেই উৎসারিত হয়েছে বইয়ের কথাগুলো। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে যে ঢেলে সাজানো দরকার, সে কথাটি লেখক নানাভাবে তুলে ধরেছেন। তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই। শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার মান, শিক্ষকের যোগ্যতা, বাস্তব জীবনে শিক্ষার প্রয়োগ, শিক্ষা প্রাপ্তির সাথে আলোকিত মানুষ হবার সম্পর্ক– এ সবই শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত। তবে শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি নীতি নির্ধারক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ছাড়াও আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ player আছে। তার নাম family। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, একটা family হচ্ছে একটা mini-government। দেশের এই mini-government-গুলো ঠিকভাবে কাজ করলে সরকারও ঠিকভাবে কাজ করবে। সরকার চালান যে ব্যক্তিগণ, তারা তো family থেকেই আসেন। বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি যে নৈতিকতা ও সহবত-শিক্ষার প্রয়োজন হয় আলোকিত মানুষ হবার জন্য, সে শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ কিন্তু family-র মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজকে দেশের অনেক family-তেই স্বামী, স্ত্রী দু জনই রোজগার করতে বাধ্য হন পারিবারিক সচ্ছলতা অর্জনের জন্য। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, এ কারণে সন্তানকে সময় ও স্নেহদান থেকে কোনোমতেই বঞ্চিত করা চলবে না। অভিভাবকরা এখন ওঠ্ ওঠ্ ওঠ্, ছোট্ ছোট্ ছোট্, দৌড়ু দৌড়ু দোড়ু এই life styles-য়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সন্তানকে সম্পদ দিলেও সময় দেন না। ফলে নৈতিক-শিক্ষা ও সহবত-শিক্ষা গ্রহণ ভালোভাবে করা সন্তানদের জন্য সম্ভব হয়ে উঠছে না। মুঠোফোন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদকতার নেশার ঝুঁকি তো রয়েছেই। আশা করি লেখক এই দিকগুলোর প্রতি, বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থায় family-র ভূমিকা সম্পর্কে তার বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে মনোনিবেশ করবেন।

প্রফেসর আহমেদ তার বইয়ের চার নম্বর অধ্যায়ে শিক্ষা এবং সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন মডেলের একটা ছক দিয়েছেন। এটা শিক্ষাবিদদের জন্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এতে পরিবেশ ইত্যাদি সব কিছুর দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। এই ছকের মধ্যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী/মানবসম্পদের মধ্যে রাষ্ট্রীয়/জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ/শিক্ষিতসমাজ ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এই গোত্রগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমার পরামর্শ হবে আগামীতে তিনি technical বা কারিগরি পেশাসমূহকেও এই ছকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন। ভুলে গেলে চলবে না যে– চাষী, মজুর, জেলে, মাঝি, কামার কুমোর, কলকারখানায় ও পরিবহনে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাজের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গোটা সমাজটা। সময়ের সাথে সাথে এই সব পেশায় নানা রকম উদ্ভাবন ঘটেছে– তাই এদের প্রশিক্ষণটা আমাদের উন্নয়নের জন্য একটা মূল হাতিয়ার। আমরা গার্মেন্টস শিল্প থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি– তার চেয়েও অনেক বেশি রোজগার করি বিদেশে প্রেরিত অদক্ষ শ্রমিকের উপার্জন থেকে। এই অদক্ষ শ্রমিকদেরকে বিদেশে 'মিসকিন গালি'ও সহ্য করতে হয়। আমরা যদি নানা পেশায় (যেমন হাইগ্রেড প্লাম্বিং, গ্লাস টু মেটাল সিলিং, প্রিসিসন লেদ, ইংরেজি ও আরবি ভাষার দক্ষতা ইত্যাদি) দক্ষ জনশক্তি রপ্তানী করতে পারতাম, তাহলে আমাদের 'ফরেন রেমিটেন্স' দ্বিগুণ নয় বহুগুণে বৃদ্ধি পেত। দুর্ভাগ্যবশত এ কাজটা আমরা এখনও করে উঠতে পারিনি। এ ব্যাপারে আর দেরি করা মোটেই সমীচীন হবে না।

লেখক মানবসম্পদের উন্নয়নের কথা যথাযথভাবেই উল্লেখ করেছেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে এটাকে HRD বা Human Resource Development হিসাবে উল্লেখ করা হয়। Value Addition বা মূল্য সংযোজন এই HRD-এর উপরই নির্ভর করে। সিঙ্গাপুর এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সিঙ্গাপুর (যার আয়তন বৃহত্তর ঢাকা শহরের এক-তৃতীয়াংশ এবং জনসংখ্যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৫৭ লক্ষ মাত্র) এর ২০২০ সালের (PPP অর্থাৎ purchasing power parity ভিত্তিক) বার্ষিক আয় ৫৫১.৬৩ বিলিয়ন আন্তর্জাতিক ডলার। ২০২০ সালে বাংলাদেশের আয় (একই

ভিত্তিতে) ৮৬৪.৮৮ বিলিয়ন আন্তর্জাতিক ডলার। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ হয়েও সিঙ্গাপুরের মতো একটি শহর-রাষ্ট্রের আয় বাংলাদেশের আয়ের শতকরা ৬৩ ভাগেরও বেশি। সিঙ্গাপুরের কোনো Debt নেই। সিঙ্গাপুরে কোনো কাঁচামালও নেই। তাহলে সিঙ্গাপুরের এত আয় আসে কোথা থেকে। উত্তর একটাই। সিঙ্গাপুর দক্ষতাভিত্তিক Value Addition ও সেবা (service) তে বিশ্বাস করে। এর আইনশৃঙ্খলা ও পরিবেশ-বান্ধব পরিস্থিতির কারণেই ইলেকট্রনিকস দ্রব্যসামগ্রী ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও রপ্তানি, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন এবং পৃথিবীর ব্যস্ততম সমুদ্রবন্দরের তৎপরতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সিঙ্গাপুরের দক্ষ মানবসম্পদ-ভিত্তিক অর্থনীতি। এ সব দেখে-শুনে আমি নিজেই মানবসম্পদ সম্পর্কিত একটি সমীকরণের সন্ধান পেয়েছি। ইংরেজিতে লিখলে যেটি নিম্নরূপ:

যদি

No. of 'human beings' in a country	=	No. of human heads in that country

হয়, তবে সেই দেশই হবে সত্যিকার অর্থে মানবসম্পদ সজ্জিত।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা অনেক। কিন্তু 'মানুষের' সংখ্যা কম। এখানে মানুষ বলতে আমি সেই মানুষকে বোঝাচ্ছি, যে মানুষ জীবিকার জন্য অন্য মানুষের কাছে হাত পাতবে না। বরং সে তার মেধা, শিক্ষা, মূল্যবোধ ও পরিশ্রম দিয়ে স্রষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী ভালো কাজ করবে ও সৃষ্টির সেবা করবে। এই ধরণের 'মানুষ' তৈরি করতে হলে, ভালো শিক্ষক আগে তৈরি করতে হবে।

লেখক শিক্ষকদের বেহাল অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। এ অবস্থার ব্যাপারে আমারও কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে স্কুল ছুটির সময় আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলের গণিত ও বিজ্ঞান কিভাবে জীবনঘনিষ্ঠভাবে পড়ানো যায়, সে ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। সর্বত্র যে চিত্রটি দেখেছি তা হল, সহজে হৃদয়গ্রাহী করে বিজ্ঞান ও গণিত পড়ানোর কোনো প্রশিক্ষণ তারা পাননি। অনেকেই স্বীকার করেছেন– অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে তারা এ পেশায় ঢুকেছেন, তাও অনেক

কাঠখড় পুড়িয়ে। অনেকে এটাও বলেছেন, তাদেরকে সব সাবজেক্ট পড়াতে হয়, অন্য বিষয়ে শিক্ষক নেই বলে। শিক্ষকের পদ আছে, অথচ শিক্ষক নেই। অথবা পদই সৃষ্টি করা হয়নি। এ এক ধরনের বেহাল অবস্থাও। প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ কোন স্কুলে কতজন পেয়েছে তা খবরের কাগজে পরীক্ষার্থীদের ছবিসহ ছাপানো হয়। কিন্তু গ্রামেগঞ্জের খবর অন্য রকম। দেশ কি শুধুই ঢাকা-কেন্দ্রিক হবে! অথচ গ্রামেও মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্ম হলে তাদেরকে আমরা টেনে আনতে পারছিনে। এ এক বিরাট ব্যর্থতা।

পরিশেষে মানুষ গড়ার কারিগর সেই 'শিক্ষক গড়ার' আয়োজনটা কি হতে পারে, সেই ব্যবস্থাটার কথা বলেই আমার লেখা শেষ করতে চাই। ব্যবস্থাটা আর কিছুই নয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতই একটা স্বাধীন শিক্ষা কমিশন গঠন করে তার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা। যারা শিক্ষাকে profession of the last choice হিসাবে গণ্য করে, তারা ছাড়া শিক্ষাকে যারা একটা উৎকৃষ্ট পেশা হিসাবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে, তাদেরকে বাছাই করাই হবে এই শিক্ষা কমিশনের আসল উদ্দেশ্য। এখানে যে-কোনো ধরণের সুপারিশ প্রার্থীর বিপক্ষে যাবে, এটা গঠনতন্ত্রের মধ্যেই লিখিত থাকবে এবং এটা কঠোরভাবে মানতে হবে। প্রাথমিকভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য একটা লিখিত পরীক্ষা হবে। প্রশ্নগুলো হবে জীবন ও পরিবেশ ভিত্তিক এবং বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের স্বচ্ছতাকে কেন্দ্র করে। এতে যারা ভালো কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে, তাদের জন্য একটা মৌখিক পরীক্ষা হবে। কোন বিশারদ কোন মৌখিক পরীক্ষায় থাকবেন, তা শেষ মুহূর্তের এক মিনিট আগেও জানবার উপায় থাকবে না। এরপরও থাকবে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। যেখানে পরখ করে দেখা হবে শিক্ষকতা করার জন্য যে ধৈর্য, মানসিক প্রবণতা ও নোতুন জিনিস নিজে পড়ে ছাত্রদেরকে পড়ানোর আগ্রহ এবং শিক্ষক হিসাবে প্রার্থী মর্যাদা বোধ করেন কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো। এই কঠিন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের একটা তালিকা (বাৎসরিক ভিত্তিতে) প্রকাশিত হবে। যদি কোনো স্কুল বা কলেজ এই তালিকা থেকে কাউকে বাছাই করে নিয়োগ করে, তবে সরকারের কিছুই বলার থাকবে না। সরকার শুধু

দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের শিক্ষকতাকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে। শিক্ষকের স্বল্পতা হেতু এই প্রশিক্ষণ দূরশিক্ষণ modalities-এর মারফতও হতে পারে। শিক্ষকদের একটা নিয়মিত মূল্যায়ন করা দরকার। এই মূল্যায়নে সদ্য পাস করে বেরিয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদেরও একটা মতামত থাকতে পারে।

মানুষ গড়ার কারিগর নির্মাণের জন্য যাদেরকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হল এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হল, তাদের শুধু সামাজিক মর্যাদা দিলেই হবে না। দিনযাপন ও প্রাণধারণ যাতে তারা সহজভাবে করতে পারেন, সেজন্য তাদের বেতনের দিকটা নোতুন করে ভাবতে হবে। বেশ কিছুদিন আগে একজন শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন 'আমরা শিক্ষকদের বেতনই সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করব'। শিক্ষানুরাগীরা এখনও এই চেষ্টার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রফেসর হাসনান আহমেদ তার বইতে যে চিন্তা ও দুশ্চিন্তার কথা লিখেছেন, সেগুলো থেকে বেরুতে হলে অবিলম্বে সরকারকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ করা ছাড়াও শিক্ষা ও শিক্ষকের মান নিয়ে অবশ্যই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। শিক্ষাকে এক নম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে তার সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিলে দেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো আস্থা অর্জন করবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এই পদক্ষেপ গ্রহণে প্রফেসর হাসনান আহমেদের লেখাটি অবদান রাখুক, এই প্রত্যাশা করি।

আমি এই বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

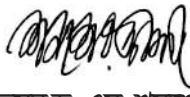

প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী
প্রফেসর ইমেরিটাস, সাউথইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী

সূচিপত্র

এক: গৌরচন্দ্রিকা ১৯

দুই: চলতি দশা ৩৭

তিন: শিক্ষায় সাত 'আর' ৪৬

চার: শিক্ষা ও উন্নয়ন মডেল ৫৪

পাঁচ: শিক্ষাপদ্ধতি ৬৮

ছয়: শিক্ষার অভিমুখিতা ৯১

সাত: পাঠ্যক্রম ও পরিশেষ ১০৬

আট: গোলটেবিল আলোচনায় বক্তাদের মতামত ১১৭

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা
চিন্তা ও দুশ্চিন্তা

এক: গৌরচন্দ্রিকা

ছোটবেলায় গানের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ ছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা ক্রমশ কমে এসেছে। তবু এখনো দূর কোথাও থেকে সুর-তরঙ্গ ভেসে এলেই সেদিকে কান খাড়া করি– আজানের ধ্বনি হলে তো বটেই! কখনো মন দিয়ে কথাগুলো পুরোটাই অনুভব করি। দিন চলে যায়। একটা গানের কলি এরকম শুনেছিলাম: 'খোকনসোনা বলি শোনো, থাকবে না আর দুঃখ কোনো, মানুষ যদি হতেই পারো।' সম্ভবত খোকনসোনার মা গানটা অনেক দুঃখে পড়ে গেয়েছিলেন, এখন ঘটনাটা পুরোপুরি মনে নেই। খোকনসোনা-খুকুসোনাদের মা-বাপ এমন করেই তাঁদের সোনামণিদের নিয়ে অনেক ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখে থাকেন। কখনো-সখনো সে-স্বপ্ন বাস্তবেও রূপ নেয়। আবার অনেক সময় সোনামণি বড় হয় বটে, মানুষরূপী মানুষই রয়ে যায়– মানুষের মতো মানুষ হয় না। লালন গেয়েছিলেন, 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন।' আমরা ক'জনই-বা মানুষের মধ্যে মানুষ-রত্নকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছি? মানুষের মধ্যে এই 'মানুষ-রত্ন' জেগে না উঠলে পরিবেশভেদে সে অমানুষ হয়, কখনো মানুষ নামের কলঙ্ক হয়। পরিপার্শ্বের সাধারণ মানুষগুলোর স্বাভাবিক জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে সুখ-শান্তি উঠে যায়। বাস্তবে তাই-ই দেখি। আরেকজন শিল্পী গেয়েছিলেন (মিতালি মুখার্জি), 'এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই, মানুষ নামের মানুষ আছে দুনিয়া বোঝাই, এই মানুষের ভীড়ে আমার সেই মানুষ নাই।' শিল্পীর মনে এতো ক্ষোভ, এতো হতাশা কেন? এই হতাশা কি বাস্তবতার প্রতিফলন? আসলেই কি দিন দিন মানুষের চিন্তা-চেতনা, ভাবনার গণ্ডি সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে? স্বার্থপরতা বেড়ে যাচ্ছে? হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, জুলুম, খুনোখুনি, দুর্বলের প্রতি সবলের আধিপত্য, প্রাবল্য ও কর্তৃত্ব, 'নরম কাঠে ছুতোরের বল' সীমালঙ্ঘন করছে? আত্মজিজ্ঞাসা, বিবেকবোধ, মনুষ্যত্ব, উদারতা, লোকলজ্জা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি ক্রমশই যারপরনাই বিলীন হয়ে যাচ্ছে? 'সেই মানুষ' কোথায় গেলো? কীসের অভাবে? কেন গেলো? দায়বদ্ধতা কার? 'দুনিয়া বোঝাই' মানুষ কি তাহলে অমানুষ? গরুর পেটে জন্মালে গরু হওয়া যায়, বাঘের পেটে

বাঘ। মানবকুলে জন্মালেই কি মানুষ হওয়া যায়? বিশ্বকবি বলেছেন, 'তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।' এই চেষ্টা কি মানুষ নিজেই করবে, না-কি সুষ্ঠু-সুন্দর পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে চেষ্টা করানো হবে? মানুষকে 'মানুষ' বানানোর এই পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা কি আমরা দিতে পারছি? মানুষ 'মানুষ' হলে কার লাভ, কার ক্ষতি? কেন 'মানুষ' হতেই হবে– এ প্রচেষ্টা? এ দেশে যত শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, সবাইকে কি আমরা মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারছি? না-কি প্রকৃতির উপর হাল ছেড়ে দিয়ে 'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না' বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি? না-কি অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত অধোগামী পরিবেশের আগুনে ঘি ঢালছি? না-কি অন্যের বরকন্দাজি দায়িত্ব পালন করছি?

আমরা বলি, প্রতিটা মানুষের মধ্যে মানুষ-রত্ন লুকিয়ে আছে। তাকে বের করে আনতে হয়, উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে লালন করতে হয়, কাজে লাগাতে হয়। তারপর একটা মানুষ 'মানুষ' হয়। মানবজীবন সার্থক হয়। তাতে তার নিজের, সমাজের, দেশ ও দশের কল্যাণ হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রময় বসবাসে শান্তির সুশীতল ছোঁয়া অনুভূত হয়। উন্নতির চরম শিখরে উঠে বিশ্বসভায় জাতি-গোষ্ঠী মাথা উঁচু করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়। এই মানুষের 'মানুষ' হওয়া নিয়ে দায়দায়িত্ব-ভাবনা কার? জনগোষ্ঠী জনসম্পদ না-হয়ে জন-আপদ হলে অসুবিধে কোথায়?

অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষ অন্যান্য প্রাণির চেয়ে বুদ্ধিমান প্রজাতি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, রাষ্ট্র গঠন করে। রাষ্ট্র কীভাবে চলবে তার পদ্ধতি মানুষ নিজেই উদ্ভাবন করে; রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিগত পুরো কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করে। শিক্ষা না থাকলে এই বুদ্ধিমান প্রজাতি অন্যান্য ইতর প্রজাতির তুলনায় আরো নীচের পর্যায়ে নিজেকে ভাবে, কর্ম ও আচরণ করে, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রকে দুর্বিসহ করে তোলে। স্বজাতি কর্তৃক তৈরিকৃত কোনো নিয়ম, পদ্ধতি ও আইনের শক্ত আগল ভাঙতে তাকে বেশি কষ্ট পেতে হয় না। এই প্রজাতিকে উপযুক্ত

শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত মানুষ, সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং জনসম্পদে পরিণত করা যায়, সুস্থ-সঠিক পথে চালানো যায়।

শিক্ষা দরকার প্রথমত, নিজের সুষ্ঠু চিন্তা-চেতনাবোধ, পরিশীলিত বিবেক ও সচেতনতা, মঙ্গল-অমঙ্গল বোঝা, পেশা নির্বাচন, আদর্শ পরিবার গঠন, ভালো মন্দ পৃথক করতে পারার ক্ষমতা অর্জনের জন্য; সুখ-শান্তিতে বসবাসের উপযুক্ত প্রগতিশীল সামাজ গঠনের জন্য; উন্নত চিন্তা ও সেবার মাধ্যমে আদর্শ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে অবদান রাখার জন্য। দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির কল্যাণ ও স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা, এবাদত, উপাসনা, প্রার্থনা করার জন্য। তৃতীয়ত, নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুকুমার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য।

জীবন থেকে নেওয়া সাম্প্রতিক একটা ঘটনা আগে বলি:
এমএমটি নামের একটা আবাসন প্রকল্পে একখণ্ড জমি কিস্তিতে কিনেছিলাম বারো বছর আগে। প্রকল্পের এমডি আমার ছাত্র। অনুরোধ করে জমিখণ্ডটা দিয়েছিলেন। কয়েক হাজার প্লট সেখানে। প্রকল্প নিয়ে ঝামেলা হওয়ায় এমডি পলাতক, দেশের বাইরে বসে লাভ গুনছেন। পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু উঠতি পদধারী মাস্তানকে সাথে নিয়ে সুযোগসন্ধানীরা এখন জমি কেনার নামে জমি দখলে মহাব্যস্ত। দীর্ঘদিনে একটু একটু করে কিস্তি দিয়ে কেনা অসংখ্য সাধারণ মানুষের দীর্ঘ-লালিত স্বপ্নের মাথায় লাঠির বাড়ি পড়েছে। দেখার কেউ নেই। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' চলছে। অন্যের জন্য লাঠিয়াল বাহিনীর সামনে কেউ এগিয়েও আসতে চায় না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানা কারণে নিশ্চুপ। এছাড়া আইনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগের বড় অভাব। এক মাস আগে আমার জমিটাও দখল হয়েছে। জীবনের সঞ্চয়– দুশ্চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া, ঘুম শিকেয় উঠেছে। সেদিন গেলাম জমিটা দেখতে। পাশের আরো দুটো জমিসহ পিলার ও কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দখল করা। জমির বর্ণনায় না গিয়ে দখলের কৌশলটা বলি। আমার টাকা বায়নারও আগে মিথ্যা বায়নানামার কাগজ তৈরি করেছে। বায়নানামা ব্যাক-ডেট দিয়ে রেজিস্ট্রি দেখিয়েছে। প্রকল্প অফিস তাকে জমিটা দীর্ঘ বছর ভোগদখল করছে– এই মর্মে ছাড়পত্র দিয়েছে। ভুয়া ক্রেতা তার কোনো আপন ব্যক্তির নামে কোনো এক

তারিখে রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে হেবানামা করে দিয়েছে। অথবা বিক্রেতার কাছ থেকে কিনেছে এমন কাগজপত্র তৈরি করেছে। কাগজপত্র পাকাপোক্ত। এসব কাজের সাথে উকিল, দলিল লেখক, আবাসন প্রকল্প অফিস, মালদার ক্রেতা, রেজিস্ট্রি অফিস, পার্শ্ববর্তী এলাকার দলীয় লাঠিয়াল বাহিনীসহ অসংখ্য পক্ষ জড়িত। তারা এ দেশেরই জনসম্পদ (না-কী জনআপদ?), যার যার লাভের অংশ নির্ধারিত। এ ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। কোনোটা দখলে রাখতে পারছে, কোনোটা বাধ্য হয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

আমি জমিতে গেলে দূর থেকে সাদা শার্ট পরিহিত, শার্টের কলারের সাথে ভ্যালভেট কাপড় দিয়ে পেঁচানো-দড়ি বেঁধে সামনে ঝুলানো এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তিনটা দামি গাড়ি রাস্তার উপর দাঁড় করানো। পায়ে চকচকে জুতো, দামি মোবাইল-ফোন সেট হাতে। পরিচয় যা দিলেন, বুঝলাম দেশব্যাপী প্রকৌশল-কর্মকাণ্ডে-জড়িত বিভাগের একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, প্রকৌশলী। টাকা ও বুদ্ধির কৌশলে ফেলে জমিটা দখল করেছেন। সাথে সঙ্গী-সাথী, আরো চার-পাঁচজন স্থানীয় মাস্তান। দু-জনের চাপ দাড়ি, মাথায় টুপি। জমিটা মাটি দিয়ে ভরাট করেছিলাম আগে। তিনি বললেন, একদম একটা ডোবা ছিলো, সম্প্রতি অনেক টাকা খরচ করে ভরাট করেছি। পাশের বাড়ির দারোয়ান বললেন– না স্যার, ভরাট আগেই ছিলো। উনি তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। আমি বললাম– ভরাটকৃত জমির চারপাশে পিলার গাড়া ছিলো। তিনি বললেন– কোথাও কোনো পিলার ছিলো না। আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে বললাম– ঐ দেখুন, আমার দুটো পিলার এখনো আপনার পিলারের পাশে উপড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। উপস্থিত সবাই দেখতে পেলেন, উনি দেখতে পেলেন না। বললেন– আমি তো কোনো পিলার-টিলার দেখছিনে। আমি তাকে চশমা কিনতে বললাম। উনি রেগে গেলেন। চিৎকার করে বললেন– এত বড় স্পর্ধা আপনার যে, আমাকে চশমা কিনতে বলেন! আপনার ঐ পিলার ভেঙেচুরে ঐ বিলের মধ্যে ফেলে দেবো। দেখি, আপনাকে কে ঠেকায়! আমার কাগজপত্র সব রেডি, আপনার নামে মামলা দেবো, আপনাকে আমি দেখে নেবো। বললাম– যিনি

আপনাকে অন্যের জমি লিখে দিয়েছেন, তার নামে মামলা করুন, আমার নামে কেন? তিনি কোনো এক উকিলের সাথে চুক্তি করে টাকা দিয়ে বিচার কিনবেন, তা আমিও জানি। আরও বললাম– আমাকেসহ বিলের পানিতে ফেলে দিলেও তো আমার কিছু করার নেই, বলারও নেই। আপনি পার পেয়ে যাবেন, বহাল তবিয়তে থাকবেন, বুক আরো ফুলিয়ে পথ চলবেন। সমাজের অনেকেই আপনাকে সেলাম ঠুকবে, এটাই বিদ্যমান সমাজের বাস্তবতা। কারণ এ রামরাজত্ব তো আপনার মতো লোকদের দখলে, আমার কথা কেউ শুনলে তো! সত্য পুরোপুরি অপসৃত। আপনার এ মাস্তান বাহিনী দিয়ে এক্ষুনি এই দিনে-দুপুরে আমাকে গুম করে ফেললেও কেউ কিছু দেখেনি বলে জানাবে।

দেশের এ-দশার জন্য কোনো একক ব্যক্তি বা রাজা-প্রজা দায়ী নয়, আমরা সবাই দায়ী। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নৈরাজ্য, নীতিহীনতা, আইনহীনতা, দস্যুতা দায়ী। 'ও বন্ধু রে, এখানে সবাই কয়েদি।' মূলত এ দেশের মানবসম্পদ পচে গিয়ে মানব আপদে পরিণত হয়েছে। তাই চারদিকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। জনবসবাসে সুখ-শান্তি উঠে গেছে। এ অবস্থা একদিনে হয়নি। সাধারণ মানুষ দিশেহারা; দুর্গন্ধের দুশ্ছেদ্য আবহে অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

উনি অনেক গালাগালি করতে করতে চলে গেলেন। আমি এ দেশের এই স্বকল্পিত উচ্চমানের বিশাল এক স্বাধীন বেহেশতের শান্তিময় বাগানের ঠিক মাঝখানে যেন প্রশান্তিভরা মন নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। দক্ষিণের খোলা দিগন্তের দিকে দু-চোখ মেলে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। আমি অসহায়! কোথাও আমার কেউ নেই! সারা দেশ সোশ্যাল-টাউট, বাটপার, প্রতারক, ধোঁকাবাজ, চোর-ডাকাত, খুনি, মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ, স্বার্থপর, জিভ-উল্টানো বিবেকহীন লোকে ভরা বলে মনে হতে লাগলো। ভাবলাম– এ দেশ কেন এমন হলো! কোথায় সেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের তিন মূলমন্ত্র– মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার? 'এমন তো কথা ছি-লো-ও-না, এমন তো কথা ছিলো না।'

একটা বাস্তব ঘটনার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম মাত্র, শুধু জনসম্পদের(?) ধরন চেনাবার জন্য। এর চেয়ে আরো অভিনব, জটিল ও লোমহর্ষক অগণিত ঘটনা

প্রতিদিনের পত্রিকা খুললেই পাঠক দেখতে পাবেন। সব ক্ষেত্রেই দেখবেন– মনুষ্যত্ব দারুণভাবে লোপ পেয়েছে, শিক্ষার উপাদান হারিয়ে গেছে, মনোবৈকল্য অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিনিয়ত জিভ ঘুরিয়ে ফেলছে, কথার বরখেলাপ করছে, সত্যকে পুরো উল্টে নির্জলা মিথ্যার সাদা-চাদরে ঢেকে দিচ্ছে। কখনো সত্যের সাথে মিথ্যাকে গুলিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মাঠে-ময়দানে দাঁড়িয়ে জনসমক্ষে ডাহা মিথ্যেকথা বলছে। তবু বুক ফুলিয়ে গণমানুষের সামনে দিয়ে নির্লজ্জের মতো চলছে। আত্মজিজ্ঞাসায় মনে মনে হেরে যাচ্ছে। বাইরে প্রকাশ করছে না– পেটের বিষ মুখে এনে মধু মেখে ঢালছে। আত্মপ্রবঞ্চনা করছে। অন্য কোনো প্রাণি নয়– সবকিছু এই মনুষ্যপ্রজাতির অনেকাংশ করছে। কোনো প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের পক্ষে তো এমনটি করা সম্ভব না। আলো থাকলে অন্ধকারের অস্তিত্বও থাকবে, এটা মানি। কিন্তু অন্ধকারের আধিক্যের কারণে ফর্সা আলোও আজ আবছায়া রূপ ধারণ করেছে। আলোর প্রদীপ নিভু নিভু হয়ে গেছে। ফলে অন্য কোনো কারণে নয়, আমি এই ঘটনাটাকে এখানে একটা কেস-স্টাডি হিসেবে বিবেচনা করতে চাচ্ছি।

ওখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। তাদের বাপ-মা এবং দেশের আপামর জনগণ অনেক টাকা খরচ করে তাদেরকে 'উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত'(?) করেছেন। তিনি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা লেখা ও পড়া ভালো জানেন। তাদেরকে শিক্ষিত লোক বলা যায় কি-না? তিনি এ জালিয়াত চক্রের প্রধান হোতা। তার অর্জিত টেকনিক্যাল বুদ্ধি অপকর্মে ব্যবহার করছেন। এ চক্র ভূমি রেজিস্ট্রি ও বিচার বিভাগের আপাদমস্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত। শুধু তাই-বা কেন– এ দেশের মুক্তসমাজে, ঘাটে-মাঠে, অফিস-আদালতে, যেখানেই যাবেন সবখানে এদের প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। অধিকাংশের জিভ ঘোরে-ফেরে, বিবেকের দংশন বলে কিছু নেই, আত্মজিজ্ঞাসারও বালাই নেই। এর শেকড় সমাজের অনেক গভীরে চলে গেছে। ভুক্তভোগী সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত, আইন-বিচার বঞ্চিত, মাস্তানের ভয়ে বাকরহিত, মৃত্যুভয়ে ভীত, টাকার অশুভ দাপটে স্তম্ভিত, বসবাসে অতৃপ্ত, নরকসদৃশ জনপদে বসবাস। রাষ্ট্রীয় পদধারী ব্যক্তিরা

তথাকথিত 'মানুষ উন্নয়নের খামার' গড়ার কাজে মহাব্যস্ত। 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুল্পের হাসি'র মতো অন্তর্জ্বালানো অবস্থা। বিভিন্ন অফিস ও ব্যবসার কাজে যারা জড়িত, তাদের অধিকাংশের মধ্যে সততা ও মানবিকতার লেশমাত্র অস্তিত্ব আদৌ আছে কি-না? তাহলে প্রতি বছর দেশে জনগণের টাকায় পালে পালে কেমন শিক্ষিত মানুষ তৈরি করছি? ঐ পদধারী প্রকৌশলী আজীবন সমাজের সাধারণ মানুষকে চাকরির নামে শোষণ করে চলেছেন, কাড়ি কাড়ি অবৈধ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন। এ কাজ অবিরাম করে পার পাচ্ছেন কীভাবে? নির্মাণকাজে রডের পরিবর্তে বাঁশ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করছেন, মানুষকে 'বাঁশ দিচ্ছেন'। গণমানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। প্রকৌশল কাজে দেশকে পিছিয়ে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষের টাকায় নিয়োগপ্রাপ্ত এই রকম অসংখ্য বেড়া দেশ ও সাধারণ মানুষের পাকধরা ক্ষেত প্রতিনিয়ত সাবাড় করে দিচ্ছে। এদের কর্মকাণ্ড সমাজে শান্তি বয়ে আনতে পারে কি-না? লেখা ও পড়া যা-ই জানুক, নষ্ট ও ভ্রষ্ট চরিত্রের লোকবল দিয়ে দেশ ও সমাজের উন্নয়ন আদৌ সম্ভব কি-না? ছাগল দিয়ে চীনে মাড়ায় হয় কী-না? এভাবে এদেশে ছাগল দিয়ে চীনে মাড়ায়ের কাজ ও চিনে-বাজি আর কতদিন চলবে? আদম সন্তানকে 'মানুষ' বানানোর চেষ্টা কবে থেকে শুরু হবে? মানুষ গড়তে হলে কী কী দরকার? গড়তে পারলে কী কী লাভ হবে? সুশিক্ষার এ দৈন্যদশা কেন?

শিক্ষা এবং লেখা ও পড়া জানা বা অক্ষরজ্ঞান থাকা এক কথা নয়। শিক্ষার বর্তমান অবস্থা নিয়ে এ দেশের সচেতনমহল সম্যক অবহিত। অথচ এ অস্বস্তিকর অবস্থায় নির্বাক হয়ে কিংবা হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় একদম নেই। করণীয় করতে হবে, বলতে হবে; নইলে পরিণতি আরো ভয়াবহ হতে বাধ্য।

আগে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলা যায়:
সাধারণ স্কুল-কলেজের কথাই বলি। লেখাপড়ায় লেখাও নেই, পড়াও নেই। আছে শুধু নোটবই-গাইডবই বিক্রি, মোসাহেবি আর টিউশনি। সাথে মুখস্ত কিছু উত্তর শিখে টিক-চিহ্ন দিয়ে উপর-ক্লাসে ওঠার ব্যবস্থা। কোন নেতার বাপের নাম কী, নানির নাম কী, স্বাধীনতার ঘোষক কে? –গড়গড় করে মুখস্ত বলে যেতে

পারে। সেল ফোন ব্যবহার করে চোখের নিমিষে ইংরেজি অক্ষর দিয়ে বিকৃত বাংলায় বাক্য লিখতে পারে। রাত জেগে কানের মধ্যে পাইপ ঢুকিয়ে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার করে রাতের-পর-রাত খোশমেজাজে গল্প করতে পারে, ফেসবুকে রাতদিন ফেস দেখাতে পারে। যদি বলা হয়, আজকের পত্রিকা থেকে একটা সংবাদ দ্রুত পড়ে একটু শোনাও তো? তখন কথা দাঁতে বাধে, জিভ আর ঘুরতে চায় না। 'আমি যাই', 'সে যায়' কেন হয় বলো তো? মাথা চুলকে চুল উঠিয়ে ফেলে। হয়তো-বা বাক্য দুটো লিখতে দিলে 'আমি যায়', 'সে যাই' লিখতো, অথবা দুটোতেই 'য়' এর জায়গায় 'ই' বসাতো। এই লেখাটা তো আর টিক-চিহ্ন দিয়ে চলে না! লেখাপড়ায় লেখাও নেই, পড়াও নেই; নেই চিন্তা করতে শেখা, বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা, জ্ঞানের স্ফুরণ, সত্যের সাধনা, চিন্তাধারার উৎকৃষ্টতা, জানার পিপাসা, কোনো বিষয়ের ফিরে দেখা, শিক্ষা নিয়ে ভাবুক মন, গভীর আত্মজিজ্ঞাসা বা অধ্যবসায়। আছে অলীক কল্পনা, শিক্ষায় অমনোযোগিতা, নকলবাজি করার আসক্তি, সার্টিফিকেট প্রাপ্তির তৃপ্ত ঢেঁকুর, বেকারত্ব, দলবাজির উদগ্র শ্লোগান, মনোবৈকল্য, মিথ্যার বেসাতি, ভোগবাদী মানসিকতা। বর্তমান অধিকাংশ স্কুল-কলেজ, অন্য বড়ো নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান– লেখাপড়া নামের সার্টিফিকেটসর্বস্ব পণ্য কেনাবেচার বাজার। এসব দোষ তো আর ছেলে-মেয়েদেরকে দিয়ে পার পাওয়া যাবে না! বাপ-মায়ের দিকে, শিক্ষকদের দিকে, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দিকে চোখ তুলে তাকাতে হবে। ছেলে-মেয়েরা যা দেখছে, তাই শিখছে; যেভাবে যা পড়াচ্ছি, তাই পড়ছে ও দিনে দিনে অভ্যস্ত হচ্ছে। প্রতিটা বিষয় মন দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। 'দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!' হাতে-গোনা অল্প কিছু ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শেখে, জ্ঞানার্জন করে– তা শেখে তার নিজের আগ্রহের কারণে; সচেতন বাপ-মায়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, উপদেশ ও প্রেরণার কারণে। এগুলোতে আত্মপ্রসাদে তৃপ্তির ঢেঁকুর না তোলাই ভালো। ছেলে-মেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়তে হয়, আবার শহর-গ্রাম নির্বিশেষে বাসায় টিউটর রেখে আলাদা তালিম নিতে হয়। লেখাপড়াটা আনন্দময় না হয়ে

দুর্বিসহ ও ভীতিকর হয়ে ওঠে।বর্তমান শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষকসুলভ অবস্থা বেশ নাজুক। এটা তাঁদের অপকর্ম ও অপচিন্তার ফসল। শিক্ষকদের ইস্পাতকঠিন নৈতিকতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। বেশিসংখ্যক শিক্ষক ব্যক্তিস্বার্থ, দলবাজি, কোটারি স্বার্থ, ক্ষমতার লোভ, ফাঁকিবাজি করতে গিয়ে তাদের শাশ্বত ও প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যকে, শিক্ষকসুলভ মানসিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। নিজেদের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতি, ফাঁকিবাজী, অব্যবস্থা, বাতিল মতামতের প্রতি আনুগত্য, মোসাহেবি ও দালালি করে শিক্ষকতা পেশাকে সামাজিক অবস্থানের নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে জাত্যভিমানী শিক্ষাগুরুর মর্যাদা হারিয়েছে। এর প্রভাব সমগ্র জাতি ও শিক্ষাব্যবস্থার উপর পড়েছে। শিক্ষকতা একটা পেশাই শুধু নয়, নেশা-ব্রতও বটে। অনেককাল ধরে এ দেশের অনেক জ্ঞানী-সুশিক্ষিত ব্যক্তি ব্রত হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়ে জীবনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসছেন। সে অবস্থায়ও ভাটার টান এসে গেছে। টিকে থাকার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা বিরূপ হয়ে গেছে। শিক্ষকতার নীতি নিয়ে সামনে এগোনো দায় হয়ে গেছে। সুযোগসন্ধানী শিক্ষকরা (বর্তমান সমাজে এদের সংখ্যাই বেশি) স্কুল-কলেজে সাধ্যমতো না পড়িয়ে বাড়তি রোজগারের জন্য টিউশনির দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। স্কুল-কলেজে নামকাওয়াস্তে হাজিরা দিতে যায়। না গেলে মাসিক বেতনটা পেতে অসুবিধে হয়। মন পড়ে থাকে বাড়ির কাজ ও টিউশনির দিকে। শিক্ষকদের আবার বেতনও কম, তাতে পেট চলে না। মেধাবীরা তাই শিক্ষকতা পেশায় আসতেও চান না। অথচ শিক্ষক শুধু লেখাপড়াই শেখাবেন না, ছাত্রছাত্রীদের একজন গাইড ও মেন্টর হিসেবে কাজ করে যাবেন। রাতে শুয়েও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভাববেন। তাদের বই পড়ানোর পাশাপাশি ভালো ভালো উদ্দীপনামূলক কথা বলে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে তুলবেন। এ দেশে এরকম বৈশিষ্ট্যের শিক্ষকই-বা বর্তমানে ক-জন! এ প্রজাতির শিক্ষক ক্রমশই বিলুপ্তির পথে। আবার স্কুল-কলেজে ভালো লেখাপড়া জানা শিক্ষকেরও বড় অভাব। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে মানের এই ক্রম-ধসের শুরু একেবারে সাম্প্রতিক নয়, অকস্মাৎও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাঁদের অন্য কোথাও নেই কোনো গতি, তাঁরাই করছে পণ্ডিতি। মেঘে

মেঘে বেলা এখন অনেক বেড়েছে। স্বাধীনতার পরে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, উচ্চশিক্ষার হাজার দরজা এখন উন্মুক্ত।

সাধারণ প্রতিটা স্কুলে ধর্মশিক্ষার বই নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হচ্ছে। অথচ শিক্ষার মানের অধঃপতন হয়েছে। সুশিক্ষা ও নৈতিকতার মান আরো নিম্নমুখী। মানবিকতা ও সততার স্তর সর্বনিম্ন পর্যায়ে; বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। তাহলে শিক্ষার চিকিৎসকরা কি ভুল ব্যবস্থাপত্র বাতলাচ্ছেন? চিকিৎসা কি ব্যর্থ হতে চলেছে? আমরা কি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছি? এক্ষেত্রে জাতির ভবিষ্যৎ কী? ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে! এ জাতি কি তাহলে অন্য কোনো সম্প্রসারণবাদী ভিনদেশী গোষ্ঠীর গোলামি করে খাবে? শিক্ষার আলো না থাকলে বুনো গাঢ় আঁধারে চারদিক ছেয়ে যাবে, এটাই প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম।

মাদ্রাসা শিক্ষায়ও কয়েকটা ভাগ। কওমি মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা এবং মক্তব/নূরানি ও ফুরকানিয়া/হাফেজিয়া মাদ্রাসা। সেখানেও উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের শিক্ষা নেই বললেই চলে। সেখানেও রাজনীতির কুটিল ও জটিল বিষবাষ্প ঢুকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুন্দর ও সাবলীল জীবন ও চরিত্রকে অনেকটাই বরবাদ করে ছেড়েছে। অথচ সেখানেও অবিকশিত প্রতিভাবান ছেলে-মেয়ে রয়ে গেছে। 'শ্যামলা মাটি-মায়ের বুকে সই পাতি পরাণ', তারাও এদেশের সন্তান। পরিবেশ খুবই খারাপ, অনেকটাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। শিক্ষার পরিবেশ ও উপকরণ অপ্রতুল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অপরাধপ্রবণতা বা উঠতি বয়সে বখে যাবার মন-মানসিকতা কম। চেয়ে-চিন্তে খেয়ে কওমি, নূরানি, হাফেজিয়া মাদ্রাসার দিন চলে। এর ফলে সার্বিক জীবনে মানসিক দীনতা প্রকট। জীবনের শুরু থেকেই মনটা মরে ছোট হয়ে চিন্তার গণ্ডি চুপসে যায়। সমগ্র জীবনে সৃষ্টি-স্রষ্টার চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও জীবন-কর্ম শুধু পরকালের বেহেশত নসিবের সরু গলিতে আটকে গেছে। উচ্চশিক্ষা– এমনকি নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা পাসের দরজাও বন্ধ। ধর্মটাকেই পুরো পেশা বানিয়ে ছেড়েছে। উচ্চ-পেশাদার শিক্ষা পুরোটাই অনুপস্থিত। কোনো ছাত্রছাত্রীই এ দেশের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, জীববিজ্ঞানী, পদার্থবিদ,

হিসাববিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যবস্থাপক, শিল্পপতি, বিমানচালক ইত্যাদি শতেক পেশায় জীবন গড়ার দিবাস্বপ্নও দেখে না। একটাই স্বপ্ন– কীভাবে কোরআন ও হাদিস পড়ে সহজে বেহেশতে যাওয়া যায়; মসজিদ-মাদ্রাসার খেদমত করে জীবন পার করা যায়। ইহকালের স্রষ্টা-সৃষ্টিসেবার ইবাদত ছাড়া পরকাল যে অচল, তা জানে না, বোঝে না বা বুঝতেও চায় না, কেউ বোঝায়ও না। দুনিয়া সৃষ্টি না হলে আখেরাত থাকে কী করে? কর্ম আছে বলেই কর্মফল আছে। কর্মের অস্তিত্ব না থাকলে ফল লাভ দুঃসাধ্য– এসব চিন্তা কল্পনাতীত। লেখাপড়ায় গণিত, বাংলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পুরোপুরি অনুপস্থিত। কর্মক্ষেত্রে বেকার বা ছদ্মবেকার কিংবা নিম্নপদস্থ; 'ন'টাকা ঘুষ দিয়ে ছ'টাকা মাইনে পাই, আগা নায়ে গুন টানি' অবস্থা।

ছোটবেলায় আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে গ্রামোফোনে রেকর্ড-করা গান 'গরুর কাঁধে লাঙ্গল দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, চল যাই ভাই মাঠে লাঙ্গল বাইতে' শুনতাম। বর্তমানে তা নেই বললেই চলে। পাওয়ার-টিলার, ট্রাক্টর চলে এসেছে। প্রতিটা গ্রামের রাস্তা পিচঢালা হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকার দূর করে বিদ্যুতের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিটা মানুষের হাতের মুঠোয় আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কৌশল। সন্ধ্যায় বাংলাদেশের গ্রামের কোনো এক রাস্তার ধারে বসে চা-খাওয়া লোকটাকে সকাল হতে না-হতেই সিঙ্গাপুর শহরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিবিদ্যানির্ভর সভ্যতার উন্নয়ন সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে। যদিও বিশ্ব-মানবতার মুক্তি ও চিন্তার উৎকর্ষ যান্ত্রিক সভ্যতার অনেক নীচে– তলানিতে পড়ে আছে। অথচ এ দেশের মাদ্রাসা-পড়ুয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মাদ্রাসা ও ইসলামের খেদমত ছাড়াও উন্নত কোনো পেশা বেছে নেওয়া, বড় কিছু করা বা হওয়ার কল্পনাই করে না। কাউকে স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধও করে না। এরা মুসলমানদের সভ্যতা, ঈমান, বৈশিষ্ট্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যকে প্রাগ্রসর প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রগতিশীল না করে অজ্ঞতা ও চিন্তার বিকলতা দিয়ে পিছনের দিকে ফিরিয়ে আদিম যুগে নিয়ে যেতে চায়। অধিকাংশই কর্মবিমুখ ও গোঁড়া– আজীবন ধর্মীয় বয়ান ও দোয়া-মোনাজাত পেশায় বহাল থেকে পুরোহিতবাদের

প্রতিভু হয়ে জীবন পার করে দিতে চায়। অথচ মোনাজাত করে 'হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (সুরা বাকারা: ২০১)। মোনাজাতের গভীরতাকেও ভেবে দেখে না। যদি বলা হয়, দুনিয়ার কল্যাণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? তার পদ্ধতিই-বা কী? আখেরাতের কল্যাণের আগেই-বা দুনিয়ার কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেন? দুনিয়া আছে বলেই না আখেরাত আছে। ইসলাম যদিও একটা 'বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ', প্রগতিশীল ধর্ম ও আধুনিক জীবনব্যবস্থা; অধিকাংশ মৌলভিরা এ বিষয়ে অনভ্যস্ত, অক্ষম– বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। দুনিয়ার কল্যাণ সৃষ্টি-সেবা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে এবং আখেরাতের কল্যাণ স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত আছে কি-না আমরা অনুসন্ধান করে দেখছিনে কেন? এরা কোরআন ও হাদিস পড়েছে, প্রয়োজনে মুখস্থ করেছে, বার বার চর্চা করছে– বেহেশতে যাবার জন্য। ভুলেও এর গভীরতা নিয়ে গবেষণা করছে না; বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে তলিয়ে দেখছে না; সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ম ও তত্ত্ব-পদ্ধতি নিয়ে বেওয়াকেবহাল।

তাই শিক্ষাহারা সাধারণ যুবসমাজ ধর্ম-কর্মটাকে পশ্চাদপদ একটা ধারণা ও ব্যবস্থা হিসেবে জানে এবং জীবন পরিচালনায় অশ্লীল, জীবনবিধ্বংসী, ভোগবাদী পশ্চিমা জীবনব্যবস্থাকেই সানন্দে বেছে নিচ্ছে এবং অভ্যস্ত হচ্ছে। মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস বলে– মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই স্থান দখল করে রেখেছিল। মুসলমানরা রসায়নবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, অস্ত্রচিকিৎসা, ভূ-তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রপথিক হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করে রেখেছে। হয়তো আমাদের এসব পড়ে দেখা ও জানার সময় নেই; পির-পূজা, কবর-পূজা, পেট-পূজা ও ফন্দি-পূজা, নেতৃত্ব-পূজা নিয়ে মহাব্যস্ত। মুসলমানদের 'সিরাতাল মুস্তাকিম' থেকে সরে আসা; এবং মৌলভি-মাওলানাদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয়, অদূরদর্শী ঠুনকো বিষয় নিয়ে শতধাবিভক্তি; মানুষকে ইসলাম, কর্ম ও

বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনব্যবস্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে আবেগনির্ভর, তুচ্ছ ভাবধারার দিকে ঠেলে দেওয়া; ইসলামি জীবনব্যবস্থা একটা জীবনদর্শন ও সৃষ্টিদর্শন– এর বিশালতা থেকে সরে আসা– আমাদের এ দুরবস্থার মূল কারণ। একজন জ্ঞানী ও ভাবুক মনের অধিকারী তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে এর বিশালতা অনুধাবন করতে পারেন। এজন্য তাঁকে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনোজাগতিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানে ব্রতী হতে হবে; ইমানদার হতে হবে, কোরআন জানতে হবে। ইসলামি সৃষ্টিদর্শন গ্রহ-নক্ষত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভূমণ্ডল, জীবজন্তু, ইতিহাস, বিজ্ঞান, তুচ্ছ পিঁপড়ে, কীট-পতঙ্গ– এসবের সৃষ্টি উপাদান এবং অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াবলিও নিয়ে আলোচনা করে। বর্তমানে এদের শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা না-থাকায় সৃষ্টিদর্শন, জীবনদর্শন, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, জ্যোতির্বিদ্যা, মাতৃভাষা, গণিত, প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক সমাজবিজ্ঞান পুরোটাই অনুপস্থিত।

আলিয়া মাদ্রাসাতেও মৌলভিদের প্রাধান্য। সেখানে লেখাপড়া করে কেউ উচ্চশিক্ষায় যেতে পারে– সে সুযোগ আছে; কিন্তু মৌলভি এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তরা চিন্তাধারার অদূরদর্শিতা দিয়ে সেখানেও শিক্ষার পরিধি যতটা বিস্তৃত করা দরকার, তা না করে সংকীর্ণ করে রেখেছেন। বিশ্বজনীন চিন্তার বিকাশ নেই, জ্ঞানশিক্ষার ব্যাপকতা নেই। ভিন্ন কোনো উচ্চমানের পেশায় যাবার প্রচেষ্টা নেই। প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই। নোটবই, গাইডবই, অল্প কিছু প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে শুধু পরীক্ষার বাধা পেরোনোর অক্লান্ত চেষ্টা, কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে নিকষ অমানিশা, ঘাটে ঘটি ডোবে না। দুর্গন্ধযুক্ত কাদায় ঘটি আটকে যায়, সুপেয় পানি ওঠে না। কারণ মুখস্থবিদ্যা আছে, প্রায়োগিক ও বহির্মুখী জ্ঞানের অভাব। চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপকতা নেই। জীবনদর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান নেই। নেই উদ্ভাবনী চিন্তা, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, আধুনিক জীবনমানের ধারণা। মাদ্রাসাশিক্ষকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীদের শুধু আরবি ও ইসলামের ইতিহাস পড়তে উৎসাহিত করেন। নিজেরা বিজ্ঞান, ফলিতবিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, গণিত, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি পড়েন না বা পড়তে বলেন না; ছাত্রছাত্রীরাও তাই আগ্রহ পায় না, পড়ে না। যদিও আলিয়া মাদ্রাসাশিক্ষা কারিকুলামে অন্যান্য

বিষয়েও লেখাপড়ার সুযোগ আছে, সেদিকে গুরুত্ব একেবারেই কম– নিস্পৃহ, নির্মোহ; লেখাপড়ার মানও নীচু। সেদিকে ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। শুধু দীনের খেদমত ও পরকাল বুঝতে চান। আলিয়া মাদ্রাসাতে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই নোটবই ও মুখস্তবিদ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে। কোনো গতিশীলতা নেই।

এছাড়া ইদানীং একশ্রেণির অর্ধশিক্ষিত-আত্মম্ভরী মৌলভিদের রং-বেরংয়ের বেপরোয়া-লাগামহীন ওয়াজ-মাহফিলের প্রশস্ত-ময়দানি রকমারি বক্তৃতা ইসলামের ভাবমূর্তিকে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করছে; একটা শ্রেণির আয়-রোজগার বাড়ছে, নানা মতের নানা পথ বাড়ছে। কিন্তু শ্রোতাদের ইসলামি জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে বলা যায় না। হালকা আবেগ বাড়ছে, শত বিভেদ ছড়িয়ে পড়ছে। কে কত বড় বক্তা– তার তারিফ, গুণবর্ণন বাড়ছে। বিগত চল্লিশ বছরে মক্তব-মাদ্রাসা অনেক গুণ বেড়েছে। কোরআন-হাদিস পড়া, মিলাদ-মহফিল করা লোক অসংখ্য বেড়েছে, বেড়েছে শ্রোতার সংখ্যাও। সে-সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আলখাল্লা-পরা বেকারত্ব, ধান্দাবাজি, দলবাজি, ধর্মীয় সভায় বক্তার ফি। বাড়েনি সমাজে, অফিস-আদালতে কর্মরত সুস্থ চিন্তা-করা, জ্ঞানী-দূরদর্শী, কর্মঠ সৎমানুষের সংখ্যা– তাই পরিবেশ গেছে নষ্ট হয়ে। গলদটা কোথায়? মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের বিষয়টা আশু ভাবনার খোরাক। জানিনে, ভাবনার অগ্রগতি কতটুকু হবে কিংবা বিষয়টাকে তাঁরা ইতিবাচকভাবে নেবেন কি-না! জানিনে, এ শোচনীয় অবস্থাতেও চৈতন্যোদয় হবে কি-না! হালকা আবেগ ও গোঁড়ামি দিয়ে সুশিক্ষিত ও প্রাগ্রসর জাতি গড়া যায় না।

আমার জানা মতে, ইসলাম ধর্ম একটাই ধর্ম, একটাই পথ, একটাই পাথেয়– কোরআন ও হাদিস। কোরআন ও হাদিস এখনো অক্ষত আছে বলে ইসলাম তার স্বমহিমায় ভাস্বর ও দেদীপ্যমান। অথচ সারা বিশ্বে আজ মুসলমানরা শতধা-বিভক্ত, শত-মত, শত-পথ, দিগ্‌ভ্রান্ত। এ দেশের ধর্মকর্ম ও মাওলানাদের নিয়েও বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ কমে যাচ্ছে, ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ ও শান্তি থেকে আমরা ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছি, দেশে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের মধ্যে মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের বড্ড

অভাব দেখা দিচ্ছে। সমাজে হিংসা, হানাহানি, অনৈতিকতা নিত্য। ধর্মীয় উগ্রতা ও বিভাজন বেড়ে যাচ্ছে। এ দায় আমাদের মাথায় নিতেই হবে। এ নিয়ে ভাবতে হবে। এ অবস্থা এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত থেকে অনেকটা সৃষ্ট।

সারা বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থার কথা বলতে গেলেও ঐ একই কথা চলে আসে। নিজেদের মধ্যে অনৈক্য-বিভেদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসরতা, উগ্রবাদী বক্তৃতা ও কর্ম এদেরকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে। পুরাতন যুগের ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ এখন আর নেই, এটা এদেরকে বুঝতে হবে। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের (বিশেষ জ্ঞান) যুগ, টেকনোলজি ও বিজ্ঞানের যুদ্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর প্রতিযোগিতা। মুসলমান জাতি যদি আত্মকলহ-বিদ্বেষ ছেড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরু করে দেয়, সারা বিশ্ব এদের পদানত হতে বাধ্য। এ-জাতির আছে প্রাকৃতিক সম্পদ, আরো আছে ইমানি-শক্তি ও 'বিজ্ঞানময় কুরআন', যা অন্য কোনো জাতির নেই। এরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা না করে 'হুরতত্ত্ব', আয়েশি জীবন, ময়দানি সুরেলা বক্তৃতা ও অন্তঃকলহে লিপ্ত। এভাবেই এরা ক্রমশ পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত হচ্ছে, পরাশক্তির গোলামি করছে, পদে পদে মার খাচ্ছে। জাত্যভিমান বাঘ ক্রমশই আত্মমর্যাদা ভুলে মেছো বাঘে পরিণত হচ্ছে। পরাশক্তি গোষ্ঠী তাই এদের চরিয়ে খাচ্ছে। এ দেশের মুসলমানদেরও একই অবস্থা।

এ পর্যায়ে শিক্ষার বিষয় নিয়ে আমার জানা ও দেখা হাজার হাজার ঘটনার মধ্যে মাত্র কয়েকটা বাস্তব বিষয় পাঠকবর্গের সাথে শেয়ার করবো। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার পরিচিত এক অধ্যাপক গত বছর কনফারেন্সে যোগ দিতে থাইল্যান্ড গিয়েছিলেন। তিনি শুক্রবারে জুমার নামাজ মসজিদে পড়তে গিয়ে সে-মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে পরিচিত হয়েছেন। ইমাম সাহেব ঐ দেশের একজন উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার। তিনি প্রতি শুক্রবার মসজিদে খুতবা দেন এবং ইমামতি করেন। ইমামতি তাঁর কোনো পেশা না।

আমি মালয়েশিয়ার একটা বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলাম। সেখানে

স্কুল অব অ্যাকাউন্টেন্সির ডিন, অ্যাকাউন্টেন্সি বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত, যুক্তরাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁকে প্রতিনিয়ত দেশের টিভিতে ইসলামি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেন। এমন অনেককে পেয়েছি ইসলামি জ্ঞান তাঁদের শিক্ষার ভিত্তি, অথচ টেকনিক্যাল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে স্বাধীন পেশা বেছে নিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার শত-শতজনকে পেয়েছি, ইসলামি শিক্ষার ভিত আছে, অথচ চাকরি করছেন অন্য কোনো উচ্চ-পেশায়। যে কোনো সময় নামাজে ইমামতি করছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন– আবার নিজ পেশাতে কাজ করে চলেছেন। ইসলামকে কেজির দরে বিক্রি করছেন না। একজন বাংলাদেশি আমেরিকার একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসন-এ পিএইচডি করেছেন, একটা নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভিসি, আবার ইসলামি শিক্ষায় কোরআনে হাফেজ। আমি ঢাকায় ধানমন্ডির এক মসজিদে একজন আর্কিটেক্টকে ইসলামি বিষয়ে অনেক মূল্যবান বক্তৃতা ও ইমামতি করতে দেখেছি। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য সুযোগ পেলেই সেখানে গেছি। অথচ এ দেশে যারা মাদ্রাসায় পড়তে ঢোকে, তাদের অধিকাংশই ইসলামকে পেশা হিসাবে বেছে নেয়। আসলে ইসলাম কোনো পেশা নয়– একটা ধর্ম, জীবন পরিচালনার বিধান। বেশিরভাগ মাদ্রাসার ছাত্র ক্লাস ফাইভের উপরে যায় না, কেউ কেউ উচ্চশিক্ষায় গেলে আরবি ও ইসলামের ইতিহাস সম্বল। কর্মক্ষেত্রে অধিকাংশই বেকার অথবা অর্ধ-বেকার, অন্য কোনো উচ্চ-পেশায় নেই। তবলিগ জামাতে গিয়েও লক্ষ করেছি– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ অন্যান্য শতেক পেশায় কর্মরত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ (যদিও সংখ্যায় অল্প) নিজেদের প্রয়োজনে ইসলামি জ্ঞান প্রথমে অর্জন করেছেন, এখন তবলিগের মাধমে ইসলামি জ্ঞান বিতরণ করছেন। তাঁদের উদারতা ও চিন্তাধারার ব্যাপকতা আর মাদ্রাসা থেকে কোরআন-হাদিস পড়া ফাইভ পাস বড়-হুজুর তবলিগে এসেছেন, ধর্ম বিক্রি করে উপার্জন যাঁদের পেশা– তাঁদের বয়ান, উপস্থাপনা, চিন্তাধারা, সচেতনতা ও ইসলামি জ্ঞানের পরিধি ও ভাবাদর্শের মধ্যে বিস্তর ফারাক। দেখে দেখে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিভিন্ন পেশায় কর্মরত উচ্চশিক্ষিত ইসলামি স্কলাররা কথায় কথায় কারো সাথে বাহাসে

অংশ নেন না, 'এক ঘরমে দো পির' থাকলে যেভাবে একে অন্যের প্রতি প্রতিহিংসায় মাতেন, তা মাতেন না। অনর্থক হালকা তর্ক করেন না। গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় নিমজ্জিত নন ইত্যাদি। অথচ ভিত্তিমূলে ইসলামি জীবনদর্শন, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবতা প্রভৃতি মানবিক গুণে গুণান্বিত। এর অঢেল প্রমাণ আমি অতি সচেতনতার সাথে লক্ষ করেছি। এটাকে পর্যবেক্ষণও বলা যায়। এই ব্যবধান থেকে জাতি নিস্তার পেতে চায়। ইসলাম একটা আধুনিক টেকসই বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা। একে কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও উগ্রতায় ভরে দেওয়া কোনোভাবেই বাঞ্ছিত নয়। ধর্ম সর্বজনীন। ধর্ম ছাড়া শিক্ষা খণ্ডিত। শিক্ষার ভিত্তিমূলে যার যে ধর্ম, তাকে সে ধর্ম সাধারণ শিক্ষার সাথে শিখতে হবে। ধর্ম থেকে আহরিত ভালো গুণাবলি জীবন চলার পাথেয় হিসেবে নিতে হবে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার কল্যাণে তা কাজে লাগাতে হবে। যার যেমন খুশি, উচ্চশিক্ষা কিংবা টেকনিক্যাল শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ পেশায় জীবন পরিচালনা করবে। ধর্মের ব্যবসা ছাড়তে হবে, ধর্মীয় উগ্রতা ছাড়তে হবে, পুরোহিতবাদ ভাঙতে হবে। প্রত্যেকে যখন ধর্ম শিখবে, জানবে– যার-যার ধর্ম সে-সে বুঝে পালন করবে, অহিংস সমাজব্যবস্থায় বসবাস করবে, তখন পুরোহিতবাদ আপনা-আপনি বিলীন হয়ে যাবে।

স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ছাড়াও আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, দুদক, নির্বাচন কমিশনের মতো অনেক সামাজিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশে আছে। এদের থেকেও মানুষ শিক্ষা নেয়, নেওয়াটাই উচিত। বর্তমান পরিবেশে এদের কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা না নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দূরে থাকাই শ্রেয় বলে আমার মনে হয়। রাজনৈতিক সংগঠনও এক ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তাও এ দেশে জুতসই নয়। অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, ভাঁওতাবাজি, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, রাহাজানি, শোষণ, হত্যা, গুম, অন্তর্দলীয় কোন্দল ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের কিংবা যুবসমাজের চরিত্র-গঠনমূলক ভালো কিছু শিক্ষা সেখান থেকে পাওয়ার আশা কালবোশেখি ঘনঘোর ঘনঘটার কাছে স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসে-ভরা শান্তিময় পরিবেশ চাওয়ার শামিল। বরং এ দেশের নিরুপদ্রব সমাজ ও উচ্ছল-প্রাণবন্ত ছেলেমেয়েদের উচ্ছন্নে যাওয়ার মূল কারণ– এই নীতিহীন, পথহারা, চরিত্রবিনাশী, আত্মবিধ্বংসী জঘন্য রাজনীতি। সুশিক্ষায়

প্রশিক্ষিত লোকবল এ দেশে কোথায়? তাঁরা তো নির্জীব, অসহায়, স্বেচ্ছা-ঘরবদ্ধ!

চলমান সমাজে অস্থিরতা অত্যন্ত বেশি, মানুষের কথার মূল্য তলানিতে ঠেকেছে, সর্বত্র পশুত্বের প্রাধান্য, ডাহা মিথ্যা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও প্রতারণার উদগ্র বেসাতি। কোনো কথা কাগজে লিখে রাখলেও ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে-উল্টিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নির্ভেজাল মিথ্যা বুলি আওড়ে বুক ফুলিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, মনুষ্যত্বহীনতা, নিষ্ঠুরতা ক্রমশই দানা বাঁধছে। আমরা কেউ কেউ স্বর্থান্ধতার কারণে সচেতনভাবে এগুলো অস্বীকার করছি, যদিও এ পরিস্থিতি নিখুঁত সামাজিক পর্যবেক্ষণ এবং নির্ভেজাল বাস্তবতা। আমরা উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে মৃতবৎ পড়ে পড়ে ধুকছি অথবা ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা দলীয় স্বার্থের অথই পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। কোথায় শিক্ষা? যে যা-ই বলুক, সুশিক্ষিত-চেতনাবোধসমৃদ্ধ জনসম্পদ গড়া ছাড়া এ জাতির মুক্তির আমি তো আর কোনো বিকল্প পথ দেখিনে।

অনেক অসহনীয় ও আপত্তিকর কথা লিখছি সত্য– সমাজের নির্মম বাস্তবতা বলেই লিখছি। কিন্তু দোষটা আসলে স্কুল-কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসার না। দোষ আমাদের পথহারা চিন্তা-চেতনার, পদ্ধতি নির্বাচনের, প্রতিকূল পরিবেশের, অদূরদর্শিতার, সদিচ্ছার অভাবের। দরকার উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষার। দরকার শিকারি বিড়ালের। লাল-টুকটুকে, নাদুস-নুদুস শরীরসর্বস্ব বাড়িভর্তি বিড়াল পুষে আমার কী হবে, যদি সে-বিড়াল ইদুর-বিতৃষ্ণ হয়! সেজন্য স্কুল-কলেজ (মাদ্রাসার অন্য নাম), বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পথ ও পদ্ধতি পরিশুদ্ধ ও পরিবর্তনের মাধ্যমেই সুশিক্ষিত সদাজাগ্রত জনগোষ্ঠী তথা মানবসম্পদ তৈরির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ– তা আমাদেরকে মানতে হবে। এখান থেকে মানবসম্পদ তৈরি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেলে অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও ক্রমশ প্রকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। শিক্ষিত জনসম্পদে সমাজ ভওে যাবে। সুশিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল-সচেতন জাতি, সমৃদ্ধ দেশ গড়ে উঠবে। অন্যথায় এ জনগোষ্ঠীর পরনির্ভরশীল, সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী শোষকগোষ্ঠীর শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাসত্ব বরণ করে দেশ ও জাতি হিসেবে ক্রমশ নিস্তেজ, নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই।

দুই: চলতি দশা

শিক্ষার বেহাল দশা ও বাস্তবতা নিয়ে ইতোমধ্যেই অনেক কিছু অকপটে বলেছি। কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় করিনি। এখানে ভিন্ন কিছু দশাও বলা দরকার।

শিক্ষার প্রয়োজনে কয়েকটা দেশ ঘোরার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাদের সমাজ, শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা, দায়িত্বশীলতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। এছাড়া বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে যে-কোনো দেশের অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করা, জানা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আমাদের দেশের মতো এতো হরেক কিসিমের ও ধরনের প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর কোনো দেশে নেই। এছাড়া হাতে গোনা দু-পাঁচটা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ এবং খরা ও দারিদ্র্যপীড়িত আফ্রিকান দেশ বাদে সব দেশের লেখাপড়ার মান আমাদের দেশের মানের তুলনায় বেশ উন্নত। এমনকি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে সুদীর্ঘ বছর একসাথে থেকেও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের তুলনায় বর্তমানে আমাদের শিক্ষার মান নীচে। আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন বিদেশে থাকেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা সে-দেশে লেখাপড়া করে। তারা যখন এ দেশে বেড়াতে আসে, তাদের সাথে কথা বলি। তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করি। এ দেশের স্কুল-কলেজ-পড়ুয়া আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বেড়াতে-আসা ছেলে-মেয়েদের তুলনা করি। অন্য-দেশে-পড়া ছাত্রছাত্রীদের লেখার মান, তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সমস্যা সমধানের সক্ষমতা, কোনো বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা এদের তুলনায় অনেক বেশি। এ দেশের সমপর্যায়ের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরা তাদের ধারে-কাছেও যেতে পারে না। এর অর্থ এই নয় যে, এ দেশের ছেলে-মেয়েরা অন্য দেশের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় কম মেধাবী। দেশের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার অব্যবস্থাপনাই এসবের জন্য দায়ী। দুটো উন্নত দেশে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ আমার হয়েছে। আর এ দেশে তো যুগের পর যুগ শিক্ষকতা করছিই। এ দেশের ছেলে-মেয়েদের গড় মেধা ঐসব দেশের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় খারাপ না, বরং ভালোই বলতে হবে। এ দেশের অনেক ছেলে-মেয়ে এ দেশের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে বিদেশে পড়তে গিয়ে দায়ে পড়ে। আমাদের শিক্ষার ভিত্তিমান খারাপ হওয়ার

কারণে অন্য দেশের ছাত্রছাত্রীদের সাথে লেখাপড়ায় টিকতে পারে না। সে-দেশ থেকেই আমার কাছে ফোন করে, এ দেশের লেখাপড়ার নিম্নমানের কথা বলে। এ দেশে তারা ভালো ছাত্রছাত্রী ছিল এবং অনেক কষ্টে রেজাল্ট ভালো করেছে বলে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তাদের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করছে– তারা তাও বলে। পরিণামে অনেকেই বেশ ভালো করে, কেউ কেউ হেরে যায়। লেখাপড়া ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরে। জীবন গড়ার দৌড়ে এই যে হেরে যাওয়া– এর জন্য দায়ী কে?

এ দেশের ছেলে-মেয়েরা বারো ক্লাস পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এখানেও দেখি অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তিমান নেই– গোড়ায় গলদ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়া সত্যি সত্যি শেখালে ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, বুঝতে পারে না। চাকরি বাঁচানোর প্রয়োজনে শিক্ষকদের বক্তৃতার মান নীচে নামাতে হয়। নম্বর অর্জন করতে পারে না, তবু নম্বর দিতে হয়। নইলে লোম বাছতে কম্বল উজাড় হয়। ছাত্রছাত্রীরাও না শিখে, বেশি বেশি নম্বর পেয়ে সার্টিফিকেট পাওয়ার আনন্দে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে শিক্ষাঙ্গন ছাড়ে। আমিও সান্ত্বনার ঢেকুর তুলি বটে– সে ঢেকুর টক, অম্ল স্বাদযুক্ত, তেতো। আমিও আত্মপ্রবোধিত সন্তুষ্টি মনে মনে প্রকাশ করি, ছাত্রছাত্রীও কৃতার্থ হয়। অথচ সার্টিফিকেটের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিজেকে পেশাদার ফাঁকিবাজ বলে মনে হয়। মাঝখানে বিবেকের দংশন, আত্মাবমাননা, আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগী। প্রায়ই, যেদিন খাতা মূল্যায়ন করি সেদিন তো বটেই, দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না। ছাড়ি ছাড়ি করেও নানারূপ যৌক্তিক পরিস্থিতির কারণে পেশা ছাড়তে পারিনে। এ এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা। 'ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না। যাহা চাই ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

বিদেশপড়ুয়া ঐসব লেখাপড়া জানা, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী ছেলে-মেয়েরা সে-দেশেই বড় হচ্ছে, জাতীয় কর্মকাণ্ডে ও সে-দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। ব্যক্তিজীবন পরিচালনা করছে। তাদের অসুবিধে অন্য জায়গায়– অধিকাংশই পথভ্রষ্ট, অন্তঃসারশূন্য ভোগবাদী ভাবধারা ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত; জীবনের সবকিছুকে শুধু অর্থ দিয়ে পরিমাপ করে– এমনকি, দয়ামায়াসহ অন্যান্য

মানবিক গুণাবলিকেও। তাদের ভালো লেখাপড়া-জানা লোক বলতে পারেন; শিক্ষিত লোক বলবেন কি? শিক্ষিত লোকই যদি বলেন, তবে বিশ্বব্যাপী এতো দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক উৎপীড়ন, সম্পদ লুটতরাজ, মানবতার নির্লজ্জ অপমান কেন? কোনো শিক্ষিত লোক কি এসব কাজ জ্ঞানত করতে পারে? এ অবস্থার পুরোটুকু আমাদের দেশেও বিদ্যমান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে প্রতিনিয়ত পড়াচ্ছি, আন্তরিকভাবে মেলামেশা করছি, তাদের ভালো-মন্দ শুনছি, দেখছি। এটাই আমার কাছে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা। নীতি-নৈতিকতা নিয়ে গভীরভাবে ভাবে, কাজ করে, মূল্যবোধে উজ্জীবিত, শিক্ষার্জনের পিপাসা আছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। এ সংখ্যা আবার দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাহলে এ দেশ ও সমাজ ভালোভাবে চলবে এমনটি আশা করা যায় কি? আলোকিত মানুষ-সম্পদ গড়ছি কোথায়? ছাগল দিয়ে কি হালচাষ হয়? আমরা দেখেও না-দেখার ভান করি, বুঝেও না-বুঝের মতো বক্তৃতা ঝাড়ি– আত্মপ্রবঞ্চনা করি। বিবেকের দংশন কোথায়?

আমেরিকা মুল্লুকে অসংখ্য নামি-দামি কোম্পানির রাষ্ট্রীয় সম্পদ শোষণ, সাধারণ মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ, আর্থিক বিবরণীতে ডাহা-মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন এবং পরিশেষে কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণা করার হিড়িক দেখে সে দেশের সরকার দেশে সারব্যানস-অক্সলে অ্যাক্ট-২০০২ চালু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, প্রাইভেট ও পাবলিক কর্পোরেশনের বোর্ড, ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক অ্যাকাউন্টিং ফার্মগুলোর কর্পোরেট ও অডিট দায়বদ্ধতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা। একই-রোগে-ভোগা অনেক দেশই 'কর্পোরেট গভর্ন্যান্স' নামে বিভিন্ন রকম আইন-কানুন জারি করেছিল। বিভিন্ন রকম 'কোড অব কন্ডাক্ট' আইন মোতাবেক মেনে চলার হিতোপদেশ দিয়েছিল। আমাদের দেশেও এগুলো আইন করে চালু হয়েছিল। এ আইন-কানুন এখনো সসম্মানে প্রায় দেশেই বিদ্যমান। তবু অন্যান্য দেশসহ আমাদের দেশে বিভিন্ন কোম্পানির নামে সাধারণ মানুষের ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটের মহৌৎসব এখনো চলছে। আমাদের দেশে 'কার গোয়াল, কে দেয় ধুমো!'– অবস্থা হওয়ার কারণে 'কর্পোরেট গভর্ন্যান্স' রিপোর্টে পজিটিভ টিকচিহ্ন দেওয়া উৎসাহভরে চলছে; পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক, বীমা,

কোম্পানিসহ নানান কিসিমের হরিলুট সদম্ভে ও সাড়ম্বরে চলছে এবং তা জ্যামিতিক হারে ক্রমশ বাড়ছে। দোষ কার? যাদের আইন মানানোর দায়িত্ব তাদের? না, আইন মানার দায়িত্ব তাদের? না দেশের? এসব জায়গায় যদি শিক্ষিত মানবসম্পদ কাজ করতো তাহলে কি এই লেজে-গোবরে অবস্থা হতো? যে দেশে নীতিবান লোকদের বোকা ভাবা হয়, হারিকেন ধরিয়ে খুঁজে পেতে হয়; সেখানে শুধু আইন করে কি আর দুর্নীতি, অনৈতিকতা, প্রতারণা, সুবিধাবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? ট্রেনিং দেবো ছাগল হওয়ার, ছাগলের খোঁয়াড়ের মতো পরিবেশ গড়বো; আবার কাঁঠালের পাতা খেতে না করবো; পাতা খেলেই, মনে মনে না ধরি, জনসম্মুখে দোষ ধরবো! সুস্থ পরিবেশে রেখে ছাগল না-বানিয়ে মানুষ বানালেই তো আর কাঁঠালের পাতা পছন্দ করে না! কথা ও কাজের সমীকরণটা তো ঠিক হতে হবে। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখা ও পড়া জানা প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন ডাকাত, ধাপ্পাবাজ, ধোঁকাবাজ, ধুরন্ধর জন-আপদ সরকারি অর্থ ব্যয় করে তৈরি করছি। আবার তারা যখন লুটপাটের আসর জমাচ্ছে, আমার জমি দখলকারী প্রকৌশলীর মতো রামরাজত্ব চালাচ্ছে, তখন মায়াকান্না কাঁদছি। নাকের ডগায় উন্নয়নের মুলো ঝুলিয়ে শুধু দিন পার করছি। মানবসম্পদ গড়ার তাগিদ অনুভব করছিনে। দেশব্যাপী নিকৃষ্ট মানের রাজনীতির বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে রাজনীতিই 'সর্ব রোগের মহৌষধ' বলে উলঙ্গ বিজ্ঞাপন সজোরে আউড়াচ্ছি। জনগোষ্ঠীর মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন এনে শিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ে দেশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের কথা মগজে ঠাঁই দিচ্ছিনে। দগদগে ঘা সারাতে অতিমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করে ঘায়ের উপর অবিরাম স্বল্পমাত্রার মলম মালিশ করছি। 'মন না-রাঙিয়ে বসন রাঙিয়ে কী করিলি ও রে যোগী!'– কথাটা বেমালুম উপেক্ষা করছি।

আমেরিকা মৌলবাদী হয়ে যাবার ভয়ে 'সারব্যানস-অক্সলে অ্যাক্ট- ২০০২'-এ 'শাশ্বত ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের মগজে ভালোমতো ঢুকাও'; 'আদর্শ মানুষ, আদর্শ জীবন গড়ো' ইত্যাদি না-লিখে সেক্যিউলারিজমের পথ ধরে আইন দিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছে। জনগোষ্ঠীর চিন্তাধারার সুস্থতা ফেরানোর চেষ্টার পরিবর্তে অর্থসর্বস্ব, ভোগলিপ্সু বিকৃত মন-মানসিকতার অবাধ চর্চা করিয়ে

আলোকিত মানবসম্পদ তৈরির চেষ্টা করছে, যা মাথায় আঘাত করে টাকের যত্ন নেওয়ার শামিল। মানবধর্ম চর্চার পরিবর্তে বিকল্প নামে সিএসআর (কর্পোরেট সোসাল রেস্পন্সিবিলিটি) কর্মের তালিম দিচ্ছে। পত্রিকায় পড়েছিলাম, আমেরিকার কোনো এক বড় শহরে এক রাত বিদ্যুৎ না থাকায় শহর নরকসদৃশ লুটপাটের ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছিল। বসবাসরত মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছিল। বোঝা দরকার, আইন দিয়ে মানুষের বিকৃত মনকে বশে আনা যায় না, সাময়িক দমন করে রাখা যায়। ধর্ম ছাড়া যে সৃষ্টি চলে না, এটা বুঝে আসে না। ধর্ম থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পুরোহিতবাদ বাদ দিয়ে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু ধর্ম বাদ দিলে যে অধর্ম বিস্তার লাভ করে, সমাজ পঙ্কিলতায় ভরে যায়, তা বোঝা দরকার। নিরেট কাঠ, পানি, চুম্বকের নিজস্ব ধর্ম আছে। বাঘ-ভালুক, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য প্রাণিরও নিজ নিজ ধর্ম আছে। যে মানুষ প্রজাতি মগজ খাটিয়ে বিশ্ব চরিয়ে খাচ্ছে, তার কোনো ধর্ম (কোড অব কন্ডাক্ট) না থাকলে বিশ্ব চলে কি করে? মানুষের মনের মধ্যে এই ধর্মবোধকে গেঁথে দিয়ে যদি মনুষ্যত্ব, সত্যনিষ্ঠা ও বিবেককে জাগিয়ে তোলা যায়, তাতে পার্থিব কাজকর্ম পরিচালনা, মানুষ ও সমাজ নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

মানুষের ধর্ম আছে কি নেই– কর্ম না দেখলে বোঝা যায় না। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণি ও বহুরূপী, তাই। প্রাক-অনুমান অতটা সহজ হয় না। ধর্মকে অস্বীকার করে নয়, বরং উপযুক্ত সময়ে মানবধর্ম (মানুষের বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব কী হওয়া উচিত) মাথায় মজবুত করে যথাসময়ে না ঢোকালে মানুষ কার্যক্ষেত্রে ইতরপ্রাণির চেয়েও খারাপ কার্যকলাপ করে। হজ, তীর্থযাত্রা দশবার করেও মনুষ্যচিত বৈশিষ্ট্য ফিরে আসে না। সুশিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রায়োগিক-চর্চার মাধ্যমে মানবসম্পদ গঠনই একমাত্র মুক্তির পথ, তা মাথায় আসে না। প্রতিটা শিক্ষাঙ্গন এক-একটা ট্রেইনিং সেন্টার হওয়া দরকার।

একটা কথা বলে রাখা দরকার। সেক্যিউলার, সেক্যিউলারিজম শব্দযুগলের ব্যাপকতা সারা বিশ্বে মানবিক মূল্যবোধের পতনের কারণ, প্রগতির শত্রু, সুশিক্ষার শত্রু, বিশ্ব-শান্তির অন্তরায়। মনুষ্যত্ব আছে বলেই তো নাম হয়েছে মানুষ। মনুষ্যত্ব না থাকলে মানুষ বলে ডাকি কীভাবে? আবার মানুষের জন্য

শিক্ষা। অথচ সেই শিক্ষাকে আমরা সেক্যিউলারিজমের নামে 'নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ; ইহজাগতিকতা; ইহবাদ (বাংলা একাডেমী ইংরেজি-বাংলা অভিধান)' জারি করে দিয়েছি। ধর্ম না থাকলে শিক্ষায় নৈতিকতা থাকে কী করে? আবার নৈতিকতা না থাকলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও অকেজো হয়ে যায়। তাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। ধর্ম মানে ইহজাগতিক কর্মের রূপরেখা। আমরা সেক্যিউলারিজমের নামে কর্মের রূপরেখাকে অস্বীকার করতে চাই। ধর্মের বিশাল আওতাকে ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে এনে ইহজাগতিকতাকে ধর্মীয় বলয় থেকে পৃথক করতে চাই। আসলে ইহজগৎ ও পরজগৎ দুটোকেই ধর্ম সম্পৃক্ত করে। ইহজগৎ ছাড়া পরজগৎ অর্থহীন ও অচল। অভিধানে সেক্যিউলারিজম বলতে ইহজাগতিক, ইহবাদকেও বোঝায়। অনেক জায়গায় এটাকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'ও বলে। সে মতো 'সেক্যিউলার' শব্দের অর্থ পার্থিব, আধ্যাত্মিক নয় এমন; ধর্মনিরপেক্ষ, জড়-জাগতিক। গোলটা এখানেই বাঁধে। রাষ্ট্রের কাছে সকল ধর্ম সমান– কথাটা বললে গায়ে বাধে না। কিন্তু আমাকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে বললেই তো যত অসুবিধে। আমি ধর্মনিরপেক্ষ হই কী করে? জন্মসূত্রেই তো আমি বাঙালি মুসলমান। বাঙালিত্ব যেমন আমি মুছতে পারবো না, তেমনি মুসলমান সংস্কৃতিতে আমি লালিত-পালিত হয়ে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস নিয়ে, ধর্ম-কর্ম করে বড় হয়েছি। এখন সব ধর্মের সংস্কৃতিতে বা ধর্মবিশ্বাসে আমি নিরপেক্ষ হই কী করে? একজন আত্মসচেতন ব্যক্তি হিসেবে অন্য ধর্ম ভালো লাগলে বা শ্রেষ্ঠ বলে মনে ধারণা জন্মালে নিশ্চয়ই এতদিনে সে ধর্মমত আমি গ্রহণ করতাম। আবার নিজ ধর্মও পালন করি। এটিও প্রমাণ করে আমি ধর্মনিরপেক্ষ নই। কোনো কোনো সনাতন ধর্মের লোক ধর্মনিরপেক্ষ নন বলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান হচ্ছেন। সংবিধানও আমাকে আমার ধর্মপালনের অধিকার দিয়েছে। আমাকে ধর্ম-অহিংস, ধর্ম-নির্বিরোধ, ধর্ম-সহিষ্ণু, ধর্ম-অরুষ্ট হতে বললে হতে পারি, কোনোই আপত্তি থাকে না। সব ধর্মের লোকদের নিয়ে মিলেমিশে একসাথে বসবাস করতে পারি কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মস্বতন্ত্র (নিরপেক্ষ অর্থ 'পক্ষপাতশূন্য, কোনো পক্ষই গ্রহণ না করা, স্বাধীন' ইত্যাদি) হতে পারিনে। এ দেশে এবং পার্শ্ববর্তী দেশে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্ম-অহিংস– এটা আমি জানি, নিজ

চোখে দেখেছি। তেমনিভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, চেতনা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা ধরে যায়। অনেকবার অসাম্প্রদায়িক হবার চেষ্টা মনে মনে করেছি, পারিনি। আমি একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস মনে ধারণ করি বলেই মুসলমান সম্প্রদায়ে আছি, ইসলামিক ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ধর্মীয় আচার-আচরণ কিছুটা পালন করি। বিশ্বাস আছে বলেই করি! আমার তো অসাম্প্রদায়িক (দলনিরেপেক্ষ, সম্প্রদায়ভিত্তিক নয় এমন, সর্বজনীন) হওয়ার কোনো উপায়ই নেই। আমার সচেতনতা দিয়ে আমি কোনো অন্তঃসারশূন্য মতবাদের দিকে নিজেকে ঠেলে দিতে পারিনে। আমি অন্য সম্প্রদায়-সৌহার্দ্য, সম্প্রদায়-সহমর্মী হতেও পারি, দেখেছি কিন্তু অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে ধর্মহারা হয়ে চলতে পারিনে। তেমনি সনাতন ধর্ম বা অন্য যে-কোনো ধর্মে বিশ্বাসী লোকই অসাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আমি হতে বলিওনে– হওয়া উচিতও নয়। আসলে অসাম্প্রদায়িকতা সেক্যিউলারিজম-এর সম্প্রসারিত রূপ। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতা শব্দগুলো আভিধানিকভাবে কিংবা উৎপত্তিগতভাবে না-বোধক অর্থে অর্থাৎ ধর্মহীনতা, সম্প্রদায়নিরপেক্ষতা অর্থই প্রকাশ করে– তা আমরা যত সুন্দর মোড়কে শব্দদ্বয়কে পেঁচিয়েই ধর্মপালন থেকে নিজেকে দূরে রাখি না কেন। তবে আমি সম্প্রদায়বিদ্বেষী হতে চাইনে, কাউকে হতেও বলিনে। সব ধর্মের লোকই মিলেমিশে একসাথে একই দেশে বাস করুক, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বিঘ্নে ধর্ম পালন করুক– এটাও আমি চাই। কারণ এর ব্যতিক্রম ভাবলেই বিশ্ব ও দেশ অচল হয়ে যায়। এ বিশ্বে বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদের অভাব নেই। মানবজাতির একটা অংশ কুরুচিশীল এবং বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন; অথচ বুদ্ধিমান। এটা তো সৃষ্টির প্রথম থেকেই আছে। এরা মনুষ্য প্রজাতিকে কিছু কিছু উদ্ভট-উদ্‌ভ্রান্ত মতবাদ দিয়ে অন্যান্য ইতর প্রাণির পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করাতে চায়। এদের কাছে পুরো মানবসমাজ ও মানবসভ্যতা আত্মসমর্পণ করতে পারে না। এদের অনুপাত যত বাড়বে, বিশ্বশান্তি-স্থিতি ততো বিঘ্নিত হবে। তাই কোনো দ্ব্যর্থ-মতবাদ প্রয়োগ করতে গিয়ে অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতা করা একেবারেই চলে না। এতে এ বিশ্বচরাচরে মানবজাতির সাবলীল ও সৃষ্টি-সেরা জীবনযাপন দুরূহ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ আস্তিক-নাস্তিক কিংবা সন্দিগ্ধমনা হলে কারো কিছু যায়-

আসে না। এটাকে মেনে নেওয়াই ভালো। কিন্তু হালকা জ্ঞান দিয়ে যে কোনো ধর্মেরই খারাপ দিক খুঁজে বের করা এবং তা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা কখনোই ভালো না, বা কুৎসিত মন্তব্যও করা উচিত না। তা কেউ ধর্ম পালন করুক চাই না-করুক।

আরেকটা কথা প্রায়ই বলি, কোথাও কোথাও লিখেছিও। উন্নয়ন কথাটা ভাবার আগে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়নের কথাটা আগে চলে আসা দরকার। শিক্ষার উন্নয়ন মানে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন, যদি জনগোষ্ঠী প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। নইলে নির্মাণকাজে রডের ব্যবহারের পরিবর্তে বাঁশের ব্যবহার, একটা বালিশ উপরতলায় উঠাতে হাজার টাকার কাছে ব্যয় এবং এমনই শত-সহস্র বাস্তব ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে অবতারণা করা যাবে। এছাড়া আরো বলি যে, শিক্ষা বলতে শুধু পড়তে জানা, লিখতে পারা ও গণিত জানাকে কোনোক্রমেই বোঝায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে নিরক্ষর লোক লেখা ও পড়া জানা লোকের চেয়ে উত্তম। এ কারণেই 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর' কথাটাও আমাদের সমাজে প্রচলিত। আমি উন্নয়ন-অর্থনীতির ছাত্র নই। তবুও উন্নয়ন বলতে অবকাঠামোগত উন্নয়নকে বুঝিনে; কোনো দেশে বসবাসরত আপামর জনগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়নের প্রশস্ততাকে বুঝি। এরপর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করলে তা হয় টেকসই উন্নয়ন। 'গড়িবার কালে যার ইস্পাত হলো চুরি, বালি দিলে ধার আসে না খালি লোহার ছুরি।' ইস্পাত ছাড়া যেমন খালি লোহার ছুরি অচল, তেমনি উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া মানসিক উন্নয়নের প্রশস্ত পথের ভাবনাও অবান্তর। আগে জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও, তারপর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়নসহ শতেক বহুমুখী উন্নয়ন আপনা-আপনিই হবে। তখন জাতীয় সম্পদের অপব্যয়, অপচয় এত বেশি হবে না, সিস্টেম লসও সীমা ছাড়াবে না। কারণ সুশিক্ষাপ্রাপ্ত সুনীতির একজোড়া উন্নত হাত আর কুটিল বুদ্ধিতে ভরা চোরা হাত কোনোক্রমেই এক হতে পারে না। আমরা দেশের টাকা খরচ করে কৌশলী চোর-ডাকাত কিংবা কুখ্যাত পকেটমার কোনোভাবেই তৈরি করার পক্ষে সাফাই সাক্ষী দিতে পারিনে। আমার জমি-দখলকারী কৌশলী প্রকৌশলীও হতে বলতে পারিনে। পেশাগত কারণে অনেক

সময়ই বিভিন্ন সেমিনার, কনফারেন্সে যেতে হয়, নানা জনের নানান কথা শুনতে হয়, বলতে হয়। দেখেছি, যিনি যে দেশে লেখাপড়া করে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই সে-দেশের সংস্কৃতি, সামাজিক বুনন, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, লেখাপড়ার সিলেবাস হুবহু নকল করে, কপি অ্যান্ড পেস্ট করে এ দেশে চালু করে দেশকে সে-দেশ বানাতে চান, উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাবার নুশকা বাতলান। আমি বরাবরই এতে দ্বিমত পোষণ করি। আমি এ দেশের বাঙালিকে কখনো ইংরেজ বা আমেরিকান বানাতে চাইনে। ভারতীয় বাঙালিও বানাতে চাইনে। তাদের চিন্তা-চেতনার সাথে আমাদের বিস্তর ব্যবধান। ভারতীয় মুসলমানদের সাথেও এ-দেশীয় মুসলমানদের চলনে-বলনে অনেক পার্থক্য আমি দেখেছি। যেমন দেখেছি পাকিস্তানি মুসলমানদের সাথে আমাদের সংস্কৃতি ও সামাজিক বুননের পার্থক্য, চিন্তা-চেতনায় পার্থক্য। পশ্চিমা সভ্যতার হুবহু অনুকরণ করতে গিয়ে এ দেশের ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজ খুব ভোগবাদ-ক্লান্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত, জীবনের উদ্দেশ্য-বিভ্রান্ত এবং নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্তঃসারশূন্য গন্তব্যের পিছনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে তারা দিশেহারা। তাদের মধ্যে দেশীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশি বাঙালি আজীবন এদেশীয় বাঙালি। আমি আজীবন বাংলাদেশি বাঙালি মুসলমান। প্রতিটা জাতির নির্দিষ্ট কিছু স্বকীয়তা রয়েছে; রয়েছে আলাদা সংস্কৃতি, সামাজিক বুনন, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা। অন্য কোনো দেশের ভালো কিছু থাকলে সেটা আমরা আত্মস্থ করতে পারি, দেশের উপযোগী করে গ্রহণ করতে পারি। নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন হতে দিতে পারিনে। জাতি গঠনে এটাও একটা শিক্ষা। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী তার অস্তিত্ব রক্ষায় এবং ক্রমবিকাশ সাধনে নিজস্ব সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, দেশীয় মূল্যবোধ, আত্মোন্নয়ন ও দেশ-গড়ার উপযোগী শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাক– এটাই সর্বোত্তম পন্থা। এখন দেখা দরকার এ দেশের ছাত্রছাত্রীরা কী কী বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হলে তাদেরকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বা দেশে মানবসম্পদ তৈরি হলো বলে বিবেচনা করা যাবে।

তিন: শিক্ষায় সাত 'আর'

শিক্ষা যে-কোনো জাতি গঠনের মূল ভিত্তি, জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি। শিক্ষাহীন মানুষ ইতর প্রাণির চেয়েও নীচু– নরাধম। শিক্ষিত লোকের মধ্যে যে যে উপাদান থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, যেগুলোকে ভিত্তিমূল বলে ধরে নেওয়া যায়, সেগুলোকে 'শিক্ষায় সাত আর' (Seven Rs in Education) বলছি। এগুলোকে এভাবে লিখছি:

১. পড়া (Reading): শিক্ষাসাধক রোমান চার্চের সেন্ট অগাস্টিনের কনফেশনস থেকেই শিক্ষার জন্য যে তিনটি 'আর'-এর ধারণা ('learning to read, and write, and do arithmetic') পাওয়া যায় তাদের একটা হচ্ছে পড়া। এ তিনটি উপাদান প্রাথমিকভাবেই শেখানো হয়। পড়তে পারাকে শিক্ষার প্রথম সোপান হিসেবে ধরা হয়। শিখতে হলে পড়তে পারাটা জরুরি। যে যে ভাবে শেখা যায়, পড়ার মাধ্যমে শেখা তাদের অন্যতম। ধর্মগ্রন্থেও প্রথম কথা এভাবে এসেছে, 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' পড়া মানে আবার গড়গড় করে উচ্চারণ করে দ্রুত সামনে এগোনো নয়। সঠিক উচ্চারণ করতে পারা, অর্থ বোঝা, বোধগম্য করা, হৃদয়ঙ্গম করা, বাস্তবতার সাথে পঠিত বিষয় মেলানো, চেতনাপ্রাপ্ত হওয়া, মনের পর্দায় তা প্রদীপ্ত (ভিজ্যুয়্যালাইজ) করতে পারা– এ সবই পড়ার অন্তর্গত।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি, পাসের সার্টিফিকেট আছে, নোটবই থেকে প্রতিটি বিষয়ে আট-দশটা প্রশ্ন পুরোটাই মুখস্থ। টেনেটুনে পড়তে পারে কিন্তু অর্থ বোঝে না, পড়া নিয়ে ভাবতেও পারে না– এ পড়া পড়তে না-পারার নামান্তর। বিষয়টা পুরোটাই পরিবেশ, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষকের সদিচ্ছা এবং ছাত্রছাত্রীদের চেষ্টা ও চর্চার বিষয়। যে কোনোভাবে ছাত্রছাত্রীদের পাস করিয়ে উপর ক্লাসে ঠেলে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যে চাপ, তা বন্ধ করতে হবে। বেশিরভাগ গ্রাম এলাকায় দেখেছি, অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলে যায় গম, টাকা ইত্যাদি পাবার আশায়; পড়ার সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই। শিক্ষকরাও পড়াচ্ছেন কিংবা রেজিস্ট্রার খাতায় নাম লিখে রেখেছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বেশি ছাত্রসংখ্যা দেখানোর জন্য। দেখারও কেউ নেই, বিষয়টি নিয়ে ভাবারও কেউ নেই। হু হু করে দিন পার হয়ে যাচ্ছে। অসচেতন বাপ-মার ছেলে-

মেয়েদের এ অবস্থা বেশি। বলতে গেলেই 'উচিত কথায় খালু বেজার'। 'কলা ছুললে ক্যানো, বুজিয়ে দেও!' ইত্যাদি সমস্যায় পড়তে হয়। গ্রামে-গঞ্জে অনেক ছেলে-মেয়েকে দেখেছি, সব অক্ষর ভালোমতো চেনে না, ক্লাস ফোর-এ পড়ে। বুঝি, এগুলো কিছুদিনের মধ্যেই ঝরে যায়, শিশুশ্রমে নাম লেখায়। এখানে মূলত 'গমও উদা, যাঁতাও ঢিলা'। দায়িত্বশীলতার বড় অভাব। আসল তথ্য কদাচিৎ আলোর মুখ দেখে। আমরা একটা পারস্পরিক দুষ্টচক্র (ভিশাস্ সার্কেল)-এর মধ্যে পড়ে গেছি। ধরা দিইনে– কিল খেয়ে নিজের স্বার্থে কিল হজম করি। এটাই নির্মম বাস্তবতা।

এই পড়া ছাড়া শিক্ষা অচল। যতই চাষাবাদ করা হোক, চিটেসর্বস্ব ধানবীজ থেকে যেমন চাষের মধ্য দিয়ে পরিণামে ভালো সুস্বাদু ভাতের আশা করা যায় না, পড়তে না-পারা শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষিত বানানোও একই অবস্থা। আধাশিক্ষিত বানানো সম্ভব। আমরা দিনে দিনে এই পড়াকে হারাতে বসেছি। এটাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।

২. লেখা ((W)Riting): লেখা 'শিক্ষায় তিন আর'-এর দ্বিতীয়টি। ভাব প্রকাশের অন্যতম একটা বলিষ্ঠ মাধ্যম। লেখা আছে বলেই লেখা দেখে পড়ার বিষয়টা আছে। শিক্ষার একটা উপাদান লিখতে জানা। অস্পষ্ট লেখা কোনো লেখা নয়। লেখা পাঠযোগ্য হতে হয়, মূল্যবান লেখা সুপাঠ্য হতে হয়। এখানেই লেখার গুরুত্ব। সমস্ত ডকুমেন্ট, দলিল-দস্তাবেজ লিখিত হয়। লেখা থাকে বলেই মানুষ তাঁর জিহ্বা ইচ্ছে করলেই উল্টাতে পারে না। ভালো লেখকের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষায় লেখা আছে বলে সভ্যতা টিকে আছে। প্রায় সকল ধর্মীয় বইই লিখিত। ধর্মে বলা হয়েছে, 'পড়ো। তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন।' এখানে লেখার মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। শত শত বছর আগে লেখা বই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম এই লেখা। লেখক লেখা দিয়ে পাঠকের মন জয় করে নিতে পারেন। পাঠকের সাথে সখ্য গড়ে তুলতে পারেন, প্রিয়ভাজন হতে পারেন। আবার অপ্রিয়ও হতে পারেন। কার ভিতরে জ্ঞান কতটুকু আছে, তার প্রমাণ লেখনী। লেখনী আছে– তাই শিক্ষা টিকে আছে।লেখা চর্চার বিষয়। হাতের লেখা ভালো করাও চর্চার বিষয়। তবে জ্ঞানগর্ভ লেখার মূল্য অপরিসীম। এ দেশে সেই পুরাকাল থেকেই লেখা ও পড়ার ধার যার যত বেশি, তাকে বেশি শিক্ষিত বলে ধরে নেওয়া হয়।

৩. গণিত ((A)Rithmatic): অঙ্কের ধারণা ছাড়া সংখ্যাত্মক হিসাব গণনা অসম্ভব। এ হিসাব যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ দিয়ে শুরু হয়। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত গণিতের সাধারণ ভিত গড়ে তোলার সময়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অজান্তেই আমরা গণিতের ব্যবহার করি। গণিতের উন্নতি মানে সভ্যতার উন্নতি। ধরে নেওয়া হয়– যে অঙ্ক যত বোঝে, বিশ্লেষণ সক্ষমতা (অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি) তার ততো বেশি। আমাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ও বিশ্লেষণমূলক কাজে গণিত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে গণিতের প্রায়োগিক দিক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এ দেশে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর গণিত জানার ভিত ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। গণিতে তাদের ভয়। বিভিন্ন গাণিতিক বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান ও কম্পিউটারের ব্যবহার আধুনিক যুগের সর্বাধিক অবদান। বিশ্ব চলে গণিতে। গণিত ও বিশ্লেষণের বিভিন্ন শাখা ছাড়া বিশ্ব কর্মকাণ্ড অচল। তাই বিশ্ব চালাতে গণিতের প্রয়োগ যে জাতি যত বেশি করতে পারে, সে জাতি টেকনোলজিতে ততো পারঙ্গম; বৈশ্বিক উন্নতিতে তারা তত উপরে। শিক্ষাতে গণিতের অন্তর্ভুক্তি বিনা কারণে নয়। কর্ম-জীবনে গণিতের প্রয়োগ বাড়ানোর জন্য। সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা (প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি) ও বিশ্লেষণ সক্ষমতা (অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি)-র মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য। সেই আদিকাল থেকে পড়া, লেখা ও গণিতকে শিক্ষার মূল মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। এই তিনটা যোগ্যতার অস্তিত্ব শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকতেই হয়। কিন্তু আদিকালের এই তিনটি উপাদান দিয়ে বর্তমান যুগের শিক্ষার মাপকাঠি বানালে চলে না। শিক্ষা আরো ব্যাপক একটা বিষয়। এ তিনটা উপাদানের বাইরেও কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি একজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকতে হয়। নইলে তাকে শুধু লেখাপড়া জানা লোক বলা যায়।

৪. ধর্ম (Religion): সেই আদিকাল থেকেই মানবজাতিকে এ ভূ-পৃষ্ঠে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম মানুষের কাজেকর্মে, চিন্তা-চেতনায় সুস্থ মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে। ধর্ম (ধৃ+ মন) মানে মন 'মূল অনুমান' (আন্ডারলাইং এজামশন)-এর উপর ভিত্তি করে যে ধারণা (বিশ্বাস) ধারণ করে রাখে। পৃথিবীর এমন কোনো ধর্ম নেই, যার মূলমন্ত্র ও অবস্থান বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবতার বিরুদ্ধে। প্রতিটা ধর্মই মানুষকে কুকথা, কুকাজ, কুপ্রবৃত্তি,

কুসঙ্গ, কুপথ, কুশিক্ষা থেকে নিবৃত করে আলোর পথ দেখায়। ধর্ম মানুষের কুপ্রবৃত্তিসমূহকে দমন করার একটা বিধান। যেখানে আলো নেই, সেখানে অন্ধকারময়; যেখানে ধর্ম নেই সেখানে অধর্ম বিরাজমান। এক রাত যদি কোনো শহর বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে অন্ধকারে ঢেকে যায়, কুপ্রবৃত্তি-তাড়িত জনগোষ্ঠী লুটপাট ও অরাজকতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে আর ধার্মিকেরা ধর্মকাজে রত হয়। ধর্ম খারাপ কাজের একটা অন্তর্নিহিত বাধা। ধর্মবিশ্বাস এমনই একটা মনের বিশ্বাস ও স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ যে, তা পালনে কোনো আইনের প্রয়োগ লাগে না। বিভিন্ন দেশে দেখেছি। কোথাও সিসি ক্যামেরা বসিয়েও জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, আবার কোথাও ক্যামেরা-ট্যামেরার কোনো বালাই নেই। এমনিতেই শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ভালোমতো চলছে। দামি দামি সম্পদ বাইরে পড়ে আছে, কেউ স্পর্শ করছে না। তাই বোধসম্পন্ন লোকদের দু-চোখ মেলে দেখার ও ভাবার অনেক কিছু আছে।

ধর্ম স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য পালন ছাড়া আর কিছুই না। ধর্ম জনসম্পদের (হিউম্যান রিসোর্স) বুনিয়াদ সৃষ্টির একটা মূল উপাদান। শিক্ষায় ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষাকে ধর্মবিচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। শিক্ষায় সেক্যিউলারিজম এনে শিক্ষাকে ধ্বংস করা হয়েছে। সেক্যিউলারিজম হলো, 'নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ'। অথচ ধর্মীয় মূল্যবোধ না থাকলে নৈতিকতা গড়ে ওঠে কীভাবে? ধর্মহীন শিক্ষা এবং স্টিয়ারিং ছাড়া যানবাহন একই কথা। ধর্ম মানুষের সাথে বিশ্বাসের নৈতিক সেতুবন্ধ তৈরি করে। ধর্ম মানুষকে অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখায়। নইলে মানুষ তার কাজকর্মে ও চিন্তায় ভারসাম্যহীন, আশাহত হয়ে পড়ে। যে শিক্ষায় সততা ও আদর্শ নেই, নৈতিকতা নেই– সে শিক্ষা মূল্যহীন। একমাত্র ধর্মই পারে শিক্ষায় সততা ও আদর্শ দিতে। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মানবতাবোধকে সুশোভিত করে।

একসময় রোভার স্কাউট লিডার হিসেবে প্রায় নয় বছর কাজ করেছিলাম। রোভার স্কাউটে একজন স্কাউটকে সমাজসেবা, নৈতিক শিক্ষা, স্বনির্ভরতাসহ জীবনমুখী বিভিন্ন বিষয়ে টেইনিং দেওয়া হয়। এগুলোর প্রায়োগিক দিককে অধিক গুরুত্ব

দেওয়া হয়। রোভার স্কাউটের মূল নীতিমালা খুব ভালোভাবে ভেবে দেখেছি। ধর্ম থেকেই এর বিভিন্ন কাজ ও সেবাকে নেওয়া হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানেই স্কাউট-শিক্ষা স্বল্প পরিসরে দেওয়া হচ্ছে। একই কাজকে ধর্মের নামে দিলে হয়তো আমাকে মৌলবাদী বলা হতো। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের রোভার স্কাউট ও গার্লস গাইডের ছায়াতলে প্রশিক্ষণ দিলেও তারা সুশিক্ষিত, সমাজসেবক ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। স্কাউটের মূলনীতিতেও স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় ধর্মশিক্ষা ছাড়া শিক্ষা ফলদায়ক হয় না।

বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে সিএসআর, কোড অব কর্পোরেট গভার্নেন্স, প্রফেশনালস কোড অব এথিক্স, বিজনেস এথিক্স ইত্যাদি অনেক কোর্স চালু করা হয়েছে। এগুলো ধর্মেরই আংশিক প্রতিস্থাপন। মৌলবাদী হবার ভয়ে মূলকে বাদ দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও আইন ও নিয়ম আকারে ভিন্ন নামে এগুলো চালু করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু মনের গভীরে নৈতিকতার প্রশিক্ষণের বীজ ভালো মতো প্রথিত না-হয়ে থাকার কারণে এথিক্স-এর সব মুখস্থবিদ্যা কাগুজে-বাঘ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কোনো উন্নতি হয়েছে বলে জানা নেই। বাস্তবতার বিচারে এগুলো প্রয়োগের কোনো মূল্যই নেই। বাস্তবে 'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল'।

৫. গবেষণা/অনুসন্ধান (Research): বুদ্ধিমান প্রাণি বলে জন্মাবধি মানুষ অনুসন্ধানী। অনুসন্ধান মানুষের জিজ্ঞাসু মনের পিপাসা মেটায়। আরো তথ্যপূর্ণ কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে। জানার আগ্রহ জ্ঞান অর্জনের সহায়ক। বার বার মানুষ একই ঘটনা শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে মনের অজান্তেই কোনো একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই গবেষণা। অনুসন্ধানী মন নেই, শিক্ষা নেই। কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান অধিক শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। যে শিক্ষায় গবেষণা নেই, মনে মনে ভাবনা নেই– সে শিক্ষা অচল ও ভঙ্গুর। গবেষণাহীন বা অনুসন্ধানবিহীন শিক্ষা স্রোতহীন মজা-দুর্গন্ধময় জলাশয়ের শামিল। অনুসন্ধান সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। সত্যানুসন্ধানী না হলে তাকে শিক্ষিত বলা যায় না। তাই গবেষণা বা অনুসন্ধান ছাড়া শিক্ষা অপূর্ণ। শিক্ষা

সৃজনশীল মননের বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তির জীবনে পরিপূর্ণতা আনে। এজন্য কোনো শিক্ষার্থী এক ঘণ্টা লেখাপড়া করে ঐ লেখাপড়া নিয়ে আবার যদি এক ঘণ্টা নিজের মতো করে নীরবে ভাবে, তার লেখাপড়ার বিষয়টাতে গভীর জ্ঞান আসে।

শিক্ষাতে ধর্ম ও গবেষণার উপাদান থাকার ধারণাটা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি এ দেশের শিক্ষা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করতেন। আমার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে আমাকেও ভাবিয়েছেন। তিনি অকালপ্রয়াত। তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। তিনি জীবিত থাকলে আমার এ লেখাটা প্রকাশের আগে তাঁকে দিয়ে একবার পড়িয়ে নিলে ভালো হতো।

৬. জাগ্রত বিবেক ও দেশীয় মূল্যবোধ (Roused-conscience and Native Values): বিবেক মানুষকে পশুধর্মী কার্যকলাপ থেকে পৃথক করেছে। শিক্ষায় মানুষের বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে, নইলে সে-শিক্ষা নিষ্ফলা মাঠের সমতুল্য। অন্য কথায়, বিবেকবোধ-রহিত কোনো মানুষকে শিক্ষিত বলা যায় না। শিক্ষিত মানুষ জাগ্রত-শাণিত বিবেকের অধিকারী হতে হবে। বিবেকহীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতা থেকে সকল অন্যায় ও অবিচারের জন্ম। মানুষের মনের অন্ধকার ও অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে তার মধ্যে সুবিচারের ক্ষমতা ও বোধশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষ নিজের কর্মকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। আত্মশুদ্ধি মানেই বিবেক বৃদ্ধি– জাগ্রত বিবেকের সৃষ্টি। ধর্মগ্রন্থে এসেছে, 'নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে– যে নিজের নফস বা আত্মাকে কলুষতা থেকে মুক্ত করেছে। আর সে অকৃতকার্য হয়েছে, যে নফসকে কলুষিত করেছে।' মানবিকতা ও মনুষ্যত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, যার আরেক নাম বিবেক; এরই অভাবে মানুষ হয় নরাধম।

শিক্ষার আরেকটা অনিবার্য বৈশিষ্ট্যের নাম চিন্তাধারার উৎকর্ষ। এটি জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধেরই একটা অংশ। সার্বিক কর্মধারা ও ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হবার একমাত্র ভিত্তি। চিন্তার ফল কর্ম। মূলত উন্নত চিন্তাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণি থেকে আলাদা করেছে। আবার এই চিন্তাধারার বিকৃতি মানুষকে নরাধম করেছে। জীবনের যত কাজকর্ম সব চিন্তাধারা দিয়েই

পরিচালিত। একজন মানুষের চিন্তাধারা তার কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কর্মধারা দিয়েই মানুষের আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতি। কর্ম নেই, কর্মফলও নেই। মানবজীবনে কর্মই মূল বিচার্য বিষয়।

সমাজ ও দেশভেদে মূল্যবোধের কিছুটা তারতম্য হয়ে থাকে। তবে চলার পথে মূল্যবোধ ও বিবেক অনেকটাই একে অন্যের পরিপূরক। মূল্যবোধ আমাদের ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে শেখায়। 'মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড। মূল্যবোধ কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাস। যে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা, আদর্শ ইত্যাদির বিকাশ ঘটে তা-ই হলো মূল্যবোধ শিক্ষা। মূল্যবোধ সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।' মূল্যবোধ মানসিক বিকাশের সহায়ক এবং সামাজিক অবক্ষয়-রোধক। এ দেশের শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকার দেশীয় শাশ্বত মূল্যবোধ সুষ্ঠু ও বিকশিত স্বাতন্ত্র্য জাতি গঠনের পরিচায়ক। দেশীয় মূল্যবোধ দেশাত্মবোধের জন্ম দেয়। তাই শিক্ষিত মানুষ দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত। মূল্যবোধ জাগ্রত বিবেককে নাড়া দেয়; মিথ্যার সাথে চলতে নিষেধ করে; অন্যায়ের কাছে মাথা নত না-করতে শেখায়।

৭. ন্যায়নিষ্ঠা (Righteousness): ন্যায়নিষ্ঠা শব্দটা অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ন্যায় অর্থ– নীতি, যুক্তি, যথার্থ, সত্য, সুবিচার– যা সত্যে নিয়ে যায় প্রভৃতি। নিষ্ঠা অর্থ– দৃঢ় অনুরাগ, আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মনোযোগ, দৃঢ়স্থিতি প্রভৃতি। শব্দার্থ থেকেই বোঝা যায় ন্যায়নিষ্ঠা কী। ন্যায়নিষ্ঠা হলো ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, পবিত্রতা, ধার্মিকতা, সততা ইত্যাদি। সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে হলে যে কয়টা গুণ অবশ্যম্ভাবী তার একটা সততা।

দুটো শব্দের কিঞ্চিৎ আলোচনা করি। এ দেশে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বলতে আমরা শুধু আর্থিক সততাকে বুঝি। সততা ও ন্যায়পরায়ণতা আসলে অনেক গুণাবলির সমষ্টি যেমন– আচরণে চারিত্রিক অখণ্ডতা (ইন্টিগ্রিটি), নৈতিকতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, স্বচ্ছতা, সৎকর্মপরায়ণতা, সঠিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, প্রতিহিংসা-মুক্ততা, কর্তব্যপরায়ণতা, অকৃত্রিমতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য, মিথ্যা-

শঠতা-চৌর্যবৃত্তিহীনতা প্রভৃতি। এ গুণগুলো মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে মহিমান্বিত করে, মানুষকে প্রকৃত মানুষে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। সমাজে অসার ধর্মহীনতা থাকলে বা কেউ ভোগবাদী ও বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তা শূন্যে অট্টালিকা নির্মাণের নামান্তর হয়। ভিত্তিমূল নেই, শিক্ষা নেই। কখনো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জায়গায় খণ্ডিত বা আংশিক শিক্ষা।

উল্লিখিত সাত 'আর'-এর বিষয়গুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু। এই উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে যদি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে জন-আপদ জনসম্পদে রূপ নেবে। এগুলো যত বেশি মানুষের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা যাবে, ততই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ। দেশের প্রতিটা পর্যায়ে মানুষ আইনের শাসন, সুনীতি ও ন্যায়বিচার পাবে। রাজনৈতিক উৎপীড়ন, লুটপাট ও নৈরাজ্য থেকে দেশ রক্ষা পাবে। এভাবে আদর্শ মানুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শ-জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। জাতি বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। অন্য সমাজ ও জাতি তাকে অনুসরণ করতে আসে। সুখী-সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গড়ে ওঠে। কোনো উপমা-উদাহরণ ছাড়া শিক্ষার মূল ভিত্তিগুলোকে অল্প কথায় বলা হলো, যার প্রতিটা বিষয়েই একটা করে অধ্যায় লেখা সম্ভব। এ ভিত্তিমূলগুলো শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হলেই তাকে শিক্ষিত বলবো। এখন এ ভিত্তিমানগুলো এবং আনুষঙ্গিক অন্য বিষয়গুলো নিয়ে কীভাবে সুশিক্ষিত সমাজ, জাতি ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব তা নিয়ে কথা বলবো।

চার: শিক্ষা ও উন্নয়ন মডেল

কেউ কেউ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়নের কথাকে নিছক কাগুজে তত্ত্ব বলে উপেক্ষা করতে চান। অথচ একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করা যায় এবং সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হয়। আমি এটাকে বাস্তবে দেখিয়ে দিতে চাই। প্রথমেই একটা মডেলের দিকে আমরা দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে পারি।

শিক্ষা এবং সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন মডেল

মূলধন আরো মূলধন বাড়ায় কথাটা সত্য। কারণ ব্যবসার মাধ্যমে বিনিয়োজিত মূলধনের বৃদ্ধি আবার পুনঃবিনিয়োজিত হয়ে মূলধন বাড়ায়। এভাবে পায়ে-চলা

পথের ছোট্ট একটা হোটেলও কালক্রমে মূলধনের সদ্ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাঁচ-তারকা হোটেলে রূপান্তরিত হতে পারে। শর্ত দুটো: এক. কিছু মূলধন তো প্রথমে বিনিয়োগ করতেই হয়; এবং দুই. সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা; এটি না থাকলে মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ পুনঃবিনিয়োজিত না হয়ে অপব্যবহৃত হয়ে চুইয়ে ড্রেন দিয়ে বিপথে যায়। অব্যবস্থাপনার জন্য তো আর মূলধন বাড়ার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না! সুশিক্ষা যেমন সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি; কুশিক্ষা ও অব্যবস্থাপনা তেমনি জাতীয় দুর্দশা, ক্রমাবনতি ও ক্রম-ধ্বংসের চলিকাশক্তি– পারস্পরিক দুষ্টচক্র বা দুষ্ট-আবর্তন, যে অভিজ্ঞতা বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তেমনিভাবে আবার প্রকৃত শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় উৎকর্ষ ও উন্নতিকে ত্বরান্বিত কওে এবং কালক্রমে পারস্পরিক ক্রমোন্নতির মাধ্যমে শীর্ষে পৌঁছে দেয়। কিন্তু শুরু তো একবার করতেই হয়, নইলে ফল আসবে কী করে! মানুষ অমানুষ হলে এদের সাথে নিয়ে অন্ধকারের পঙ্কিলাবর্তে নিমজ্জিত হওয়া সম্ভব, আবার মানুষরত্ন (মানবসম্পদ) গড়তে পারলে ক্রমাগত দেশকে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করা সম্ভব। শিক্ষা ও উন্নয়ন একে অন্যের পরিপূরক ও পরিপালক। আসল কথা হচ্ছে, আমরা ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থে বিষয়টাকে আমলে নিইনে। চেষ্টা না করে আগেই সমালোচনায় মত্ত হয়ে পড়ি, অসুবিধাটা এখানেই। নিজেও করবো না, আবার কাউকে করতেও দেবো না, পৃষ্ঠাটা উল্টিয়েই সমালোচনা শুরু করে দেবো– এটাই মূলনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেই আপত্তি।

শিক্ষার মূল ভিত্তিগুলোকে আমি ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। এখন দরকার এই ভিত্তিমূলকে বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত ও সন্নিবেশিত করা যায়– এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা।

শিক্ষার ভিত্তিমূলকে ছয়টা উপকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বা মানবসম্পদে পরিণত করা যায়। শিক্ষার্থী নিজেও শিক্ষার অন্যতম উপকরণ। প্রথমেই আসে শিক্ষকের কথা। শিক্ষা যিনি দেন তিনিই শিক্ষক। শিক্ষক ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অচল। তাই শিক্ষার জন্য আদর্শ শিক্ষকের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। আবার আদর্শবান, আত্ম-উৎসর্গীকৃত শিক্ষকের এ দেশে বেশ অভাব। দুষ্টচক্রে

পড়ে এ-সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। এ ধস যেভাবেই হোক রোধ করতে হবে। যোগ্য-নীতিবান ব্যক্তিদের এ পেশায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে। অযোগ্য-নীতিহীনদের যেভাবেই হোক এ পেশা থেকে দূরে ঠেলে দিতে হবে। এ-জাতীয় শিক্ষক নামধারী ব্যক্তিবর্গ শিক্ষাক্ষেত্রে থাকলে অবসরে না-যাওয়া পর্যন্ত অশিক্ষা-কুশিক্ষা দিয়ে অজস্র শিক্ষার্থীকে, শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করতে থাকবে। যত ভালো ভালো মাছ-তরকারিই সংগ্রহ করা হোক না কেন, রাঁধুনি ভালো না হলে খাবার বিস্বাদ হতে বাধ্য। শিক্ষকসহ আরো কয়েকটা উপাদানকে আমরা 'তৈরি প্রক্রিয়া' বলতে পারি। তৈরি প্রক্রিয়া জুতসই না হলে ভালো ইনপুট নিয়োজিত করেও বাঞ্ছিত আউটপুট পাওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের দিকটাও বিবেচনায় আনতে হবে। লেখাপড়া জানা সুশিক্ষিত লোক যাতে এ পেশায় আকৃষ্ট হন, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। আবার স্বজনপ্রীতি থাকলে পারিশ্রমিক বেশি দিলেই যে ভালো শিক্ষক আসবে এমন নিশ্চয়তা নেই। এখানেও সেই ধর্ম, জাগ্রত বিবেক ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রশ্ন এসে যায়। শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘ দিনে দলবাজ, তোষামোদকারী, ফাঁকিবাজ আপদ যা তৈরি হয়েছে, স্বেচ্ছা-অবসরের মাধ্যমে ওদের বিদায় করাই অনেক ভালো। 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ ওরে অবুঝ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' নইলে কোমলমতি ছেলে-মেয়েগুলোকে নষ্ট করে ফেলবে। নির্ধারিত মান, ভালো পরিবেশ, নীতিবান শিক্ষক– আশানুরূপ ফলাফল, একথা মানতে হবে। বেশ কিছু শিক্ষক পাওয়া যাবে, যারা প্রতিকূল দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে গা-ছাড়া ভাব (উইথড্রয়্যাল বিহেভিয়ার মুড)-এ আছেন। অনুকূল সুবাতাস পেলে তাঁরা আবার জেগে উঠবেন। এজন্য পরিবর্তন-সাধনের আগে 'মোটিভেশনাল ট্রেইনিং' দিতে পারলেই সোনায় সোহাগা। শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে ভালো শিক্ষকের বিকল্প নেই। প্রতিটা শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষা, ত্যাগ ও উদারতার গুণ থাকতেই হয়।

আজকের শিশু আগামী দিনের কর্মনায়ক, কর্ম-পরিচালক। তাকে সম্বল করেই সমাজ, দেশ, ভবিষ্যৎ। 'তুমি আছো সবি আছে, তুমি নাই কিছু নাই।' মানুষ আছে বলেই সমাজ, রাষ্ট্র। মানুষ ছাড়া রাষ্ট্র, সমাজ গঠনের ধারণা অলীক। মানুষ থাকলেই আইন দরকার, প্রশাসন দরকার। মানুষ ও প্রকৃতি মিলে সিস্টেম গড়ে।

মানুষের জন্যই সিস্টেম। আজকের শিক্ষার্থী শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের প্রকৃত মানুষ। শিক্ষা নিয়ে মানুষ পূর্ণতার দিকে যেতে চায়, কিন্তু পূর্ণতা পায় না। এজন্যই আজীবন বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা নিয়ে যেতে হয়। শিক্ষা একটা চলমান প্রক্রিয়া। প্রকৃতি ও ঘটনার কাছে মানুষ আজীবন ছাত্র/ছাত্রী। তবু জীবনের প্রথম থেকে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেয়। ছাত্রছাত্রী বলতে সাধারণত তাদেরই বোঝানো হয়। ছাত্রছাত্রী আছে বলেই অন্যান্য সব উপকরণের প্রয়োজন। পানি যেমন যে পাত্রে রাখা যায়, সে পাত্রেরই রূপ ধারণ করে; কৈশোর জীবন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরাও ঠিক তাই– কাদার পুতুল। তাদেরকে সুশিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়া আমাদের দায়িত্ব, রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অন্যথায়, রাষ্ট্রে অমানুষের সংখ্যা সীমার বাইরে ছাড়িয়ে গেলে রাষ্ট্রীয় দুর্বৃত্তায়নের ফলে নিজেরাই নিজেদের রাষ্ট্রকে গিলে খায় কিংবা রাষ্ট্রের নামটা নামমাত্র থাকলেও রাষ্ট্রময় বুনো আবহে অসুরকুলের সুর তোলে। এখানেই শিক্ষা ও দেশপ্রেমের গুরুত্ব। নাগরিকের শিক্ষা না থাকলে দেশপ্রেম আসে কী করে! এই মানুষই বনে গেলে বনমানুষ হয়, আবার শিক্ষা পেলে সভ্যতা গড়ে তোলে। 'মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।' এজন্য ছাত্রছাত্রীকে গড়ে মানুষ বানানো দরকার। ছাত্রছাত্রী মূল উপকরণ, বাকিগুলো কনভার্শন প্রক্রিয়া।

তবে এ দেশে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে ধারণা মানসম্মত নয়। অনেক ক্ষেত্রে লেখাপড়ায় অধ্যবসায় নেই বললেই চলে। দীর্ঘদিন অব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকে এবং সস্তা জনপ্রিয়তার পিছনে ছুটতে গিয়ে শিক্ষা-মানের এই অবনতি। লেখাপড়া না-শিখেই কিংবা অল্প পড়েই সার্টিফিকেট প্রাপ্তির মন-মানসিকতা গড়ে উঠেছে। প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। জীবন থেকে নেয়ার ও অভিজ্ঞতার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রতিনিয়ত অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর সাথে চলতে হচ্ছে। তাদেরকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করছি। অধিকাংশেরই ধারণা ও মানসিক গাঁথনি এমনভাবেই গড়ে উঠেছে যে, একটা সার্টিফিকেট থাকলেই চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারবে। কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। গলদটা মূলত এখানেই। প্রকৃতপক্ষে সোনার হরিণের পিছনে ছুটছে। সার্টিফিকেটে যে চাকরি হয় না, চাকরি হয় তার

যোগ্যতায়, তা বুঝতে চায় না। আবার সার্টিফিকেটভিত্তিক চাকরি যে নেই, তাও সত্য নয়। সরকারি ক্ষেত্রে একথা অনেকটাই খাটে। সেখানে টাকার বিনিময়ে ও দলীয় পরিচয়ে চাকরি হচ্ছে, গণমাধ্যম তাই বলে। এই দৃষ্টান্ত অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের জীবনের সুস্থ মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে দিগভ্রান্ত ও শেখার মানসিকতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পত্রিকার পাতা উল্টালেই তা চোখে পড়ে। কিন্তু কর্পোরেট লেভেলে সার্টিফিকেটের সাথে সাথে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করার সক্ষমতা ও কাজ জানার দক্ষতা চায়। টেকনিক্যাল জ্ঞান ও বিশ্লেষণ সক্ষমতা (অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি) দেখতে চায়। কাজ জানারও যে আলাদা একটা মূল্য আছে এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না। অনেক অনভিজ্ঞ, ঘা না-খাওয়া ছাত্রছাত্রী এগুলো আদৌ আমলে নিতে চায় না। কাজ শিখতে হবে, ভাবনা শিখতে হবে, যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, এটা ভাবতেই চায় না। শখের বশে নগদ কচকচে টাকা ব্যয় করে হাঁটু-ছেড়া ফুলপ্যান্ট কিনে নিয়ে হাসিমুখে বাসায় ফেরে। ট্র্যাজেডিটা এখানেই। তাই বেকারত্বে ভোগে। অপরিপক্ক ভুল ধারণা নিয়ে আজীবন ভুগে ভুগে জীবনের দায় শোধ করে। কাজ-জানা লোকের এদেশে এখনও কাজের অভাব নেই। এটাকে রোধ করতে হলে সামাজিক অবিচার সংযমন করতে হবে। শিক্ষার জন্য কেন্দ্র থেকে মান নির্ধারণের পর সে-মান যে কোনো মূল্যে অর্জন করার ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয়ভাবে কোনো পক্ষ যেন প্রভাব বিস্তার না করে, কিংবা কোনো জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ক্যামেরার সামনে এসে কিছু না-জেনে, না-বুঝে কোনো সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য সস্তা বিবৃতি না-দিয়ে বসেন– সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। নইলে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্রয় পেয়ে উচ্ছন্নে যায়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়। শিক্ষার মান নামানো যত সহজ, বাড়ানো বেশ কঠিন। প্রতিটা ক্লাসে ক্লাস-শিক্ষার পাশাপাশি ক্লাসের প্রথমে অথবা শেষে পাঁচ-দশ মিনিট সময় নিয়ে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের ভালো কিছু ভবিষ্যতের কথা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বলবেন, তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন। সপ্তাহ শেষে শিক্ষকরা একটা বড় রুমে কয়েকটা ক্লাস একসাথে করে জীবন উন্নয়নের কিছু জীবনঘনিষ্ঠ ইতিবাচক প্রসঙ্গ বেছে নিয়ে তার উপর ছাত্রছাত্রীদের কথা বলতে বলবেন। প্রসঙ্গ নিয়ে নিজেরাও বলবেন। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতা করবে। এতে ছাত্রছাত্রীদের মনে

বিষয়টা ক্রমশই গেঁথে যাবে। শিক্ষকদেরও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে সময় দিতে হবে। কো-কারিকুলাম অ্যাকটিভিটির দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। অন্তত দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এ-প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রতিটা শিক্ষককে শিশু-মনোবিজ্ঞানের উপর লেখাপড়া করতে হবে, অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে। দেশব্যাপী শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্বহীনতা ও গা-ছাড়া ভাব চলে এসেছে। এ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বা বের করে আনতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সময় দিতে হবে। বুঝতে হবে, শিক্ষকতা শুধু একটা পেশাই নয়– একটা ব্রতও বটে। সমাজে নিজেদের মর্যাদা নিজ নিজ কর্ম দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শিক্ষাদানের মধ্যে শিক্ষক-ছাত্রের মাঝখানে অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রতিটা অভিভাবক তার সন্তানের লেখাপড়ার উন্নতি চান, সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে চান। অভিভাবক তার সন্তানকে শিক্ষাদানে সহযোগিতা করবেন। বাড়িতে তার সন্তানকে উপযুক্ত পরামর্শ ও স্নেহ দিয়ে সার্বক্ষণিক চোখে-চোখে রাখবেন, যা একজন শিক্ষকের পক্ষে শুধু স্কুলে বসে সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষকরা প্রতিটি শ্রেণির জন্য ত্রিপক্ষীয় 'শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক' সম্বন্ধ (ট্রাই-পর্টাইট রিলেশনশিপ) তৈরি করবেন। তাঁদের সাথে নিয়মিত বসবেন। অভিভাবককে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর উল্লেখযোগ্য কৃতকর্ম (পারফরমেন্স) জানাবেন। প্রয়োজনে অভিভাবককে অনুপ্রাণিত (মোটিভেট) করবেন, ছাত্র/ছাত্রীর উন্নয়নে এগিয়ে আসতে বলবেন। শিক্ষা প্রশাসন অভিভাবক ট্রেইনিংয়ের অবশ্যই ব্যবস্থা করবে। তাদেরকে শিক্ষা-সচেতন করে তুলবে। কোনোক্রমেই অভিভাবকের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা যাবে না। কোনো অভিভাবকের অন্যায় আবদারকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। অভিভাবককেও ছাত্র/ছাত্রীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করার পরামর্শ দেবেন।

প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিভাবকমহলের প্রত্যক্ষ, আন্তরিক এবং সক্রিয় যোগাযোগ-ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটা অভিভাবক তাঁর সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করেন। এই মনোভাবকে ছাত্রছাত্রীদের জীবনোন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অভিভাবকদের সহযোগিতা ছাড়া শুধু শিক্ষকের একার পক্ষে ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষাদান সম্ভব নয়।

অভিভাবকদের সাথে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাড়িতে শাসনে রাখাও সহজসাধ্য। অভিভাবকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে বললে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়েরা আসেন। বাবাদেরও আসার কথা বলতে হবে, সন্তানের উন্নয়নে তাঁদেরও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা চাইতে হবে। অভিভাবকদের বোঝাতে হবে– পারিবারিক শিক্ষা ছাত্রছাত্রীর জীবনে অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে, যা এ দেশের যান্ত্রিক জীবনে প্রায় বিলীন হতে চলেছে।

মূল কথা, এ দেশে শিক্ষার পরিবেশের বড় অভাব। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ শিক্ষার উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য 'মহান রাজনীতিবিদ'দের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুখের দিকে চেয়ে হলেও অন্তত শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতির ব্যবসাটা বন্ধ করতে হবে। তাঁদের যুক্তি, উপদেশ আজন্ম শুনে আসছি, দেখছি। এ বিষয়টা নিয়ে কোনো হিতোপদেশ শোনার মতো রুচি আমার নেই। অন্তত শিক্ষাকে বাঁচান, নইলে শিক্ষার অভাবে আম-ছালা সবই যাবে। শিক্ষাঙ্গন অসুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ও আবহ থেকে মুক্তি চায়। শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতি বলতে আমি শিক্ষার্থী নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষকদের দিয়ে রাজনীতি, শিক্ষা উপকরণ নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষক নিয়োগে রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা প্রশাসন নিয়ে রাজনীতিকে বোঝাতে চাচ্ছি। এছাড়া উন্মুক্ত সমাজে কেউ রাজনীতি করতে চাইলে তাতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। শিক্ষাঙ্গন-রাজনীতি দেশের অন্তরাত্মাকে অগোচরে কুরে-কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। 'মজা মারে ফজা ভাই, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকমহলের কেবল ঘুম কামাই' সার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা যত ধ্বংস হবে, দেশে রাজনৈতিক পরিবেশও দিনে দিনে ততো খারাপ হবে। শিক্ষাঙ্গন নষ্ট হয়ে যাওয়াতে কত-শত অভিভাবকের যে এক-টুকরো আরব্ধ-স্বপ্ন অঙ্কুরেই নিঃশেষ হয়ে চিরদিনের মতো শূন্যে হারিয়ে যাচ্ছে– তার হিসাব কেউ রাখে না বা রাখার গরজও অনুভব করে না। সেজন্য ডিম আগে, না মুরগি আগে– এ তর্কে না গিয়ে মুরগিকেই আগে বলে ধরে নিই। দেশে শিক্ষার হার (স্বাক্ষরতার হার নয়) বাড়লে অফিস-আদালতে, মাঠে-ঘাটে, কলে-কারখানায়, সমাজে ও রাজনৈতিক পরিবেশেও এর সুপ্রভাব পড়তে বাধ্য। কিন্তু রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন দিয়েই কাজটা শুরু হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে অল্প দু-একটা কথা না-বলে পারছিনে। শিক্ষাঙ্গনকে প্রথমত রাজনৈতিক কলুষতামুক্ত করতে হবে। সেখানে রাজনীতির অঙ্গসংগঠন নামে কোনো সংগঠন থাকবে না। সেখানে 'ছাত্রসমাজ' নামে একটাই ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলা যেতে পারে, যে সংগঠনের কর্মীরা হবে শিক্ষা, দেশ ও অধিকার সচেতন। ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই হবে তাদের মূল কাজ। তারা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করতে পারবে না। রাজনীতির ব্যবসায় পার্টনার হওয়া যাবে না। শিক্ষা শেষে তাদের কেউ বৃহত্তর সমাজে এসে যে-কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে কারো আপত্তি থাকার কথা না।

এ দেশে এমন কোনো জেলা, উপজেলা, গঞ্জ নেই যেখানে কিশোর গ্যাংয়ের অস্তিত্ব নেই। পত্রিকার পাতা খুললেই প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে কিশোর গ্যাং ক্রমশই বিস্তার লাভ করছে। কিশোর গ্যাংয়ের দলীয় গডফাদাররা পর্দার অন্তরালে থেকে পুতুল নাচাচ্ছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নেশা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি এর প্রধান কারণ। ভেবে দেখুন, এই নেশাসক্ত আদমসন্তান সমাজ ও জাতিকে কী দেবে! এজন্য আইনের শাসন দরকার। আজকের দুর্বৃত্ত-কিশোরই বড় হচ্ছে, সমাজের কাজে অংশ নিচ্ছে। রাজনীতির সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন ও আইনহীনতা, কিংবা আইন প্রয়োগে ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড দেশের সুন্দর-শান্ত সামাজিক পরিবেশকে ক্রমশই ধ্বংস করে দিচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিশোর অপরাধ দিন দিন বাড়ছে। আমরা আমাদের মনমতো নেতা সৃষ্টির উল্লাসে চার ছিটিয়ে মাছ শিকারে মত্ত। শিক্ষার উন্নয়নই কেবল পারে এগুলো কমিয়ে সহ্যসীমায় নিয়ে আসতে।

ছোটবেলায় দেখেছি, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান করে নিতে। চাকরিতেও তাঁরাই বড় বড় পদে গেছেন। স্কুলে নীতিবান শিক্ষকেরা ছিলেন, শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন হেডমাস্টার ছিলেন। এখন সেখানে দলবাজদের অবাধ বিচরণ আর শিক্ষকদের টিউশনির রমরমা ব্যবসা। সে দিন কোথায় হারিয়ে গেলো! কেন গেলো? মূলত জাতি হিসেবে আমরা অপরিণামদর্শী– নগদ প্রাপ্তিটা বেশি বুঝি। ভাবী আত্ম-

ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে অলীক জয়কীর্তন গেয়ে সুরধ্বনিতে চারপাশ ভাসিয়ে দিই। বর্তমানে প্রতিটা গ্রাম-গঞ্জের পাড়ায়-পাড়ায়, প্রতিটা মহল্লায় চায়ের দোকান। প্রতিটা দোকানে, বাড়িতে সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত টিভির পর্দায় দেশি-বিদেশি বাংলা-হিন্দি ছবির রমরমা আসর, চরিত্র-বিধ্বংসী সিরিয়াল-নাটক অবিরাম চলছে; কাঁচা মনে কাঁচা রংয়ের প্রলেপ দিচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা অকালেই ইঁচড়ে পেকে যাচ্ছে। মোবাইল ফোন ও ফেসবুকের অপব্যবহারে অসময়েই জোড়া বাঁধার জোর সন্ধান চলছে; অশ্লীল ছবি দেখায় মশগুল হয়ে যাচ্ছে, কুঁড়িতেই ঝরে যাচ্ছে। শিক্ষা ও জীবনোন্নয়ন ভেস্তে যাচ্ছে। পাড়ায়-পাড়ায় নেশার আড্ডা বসছে। রাজনীতিবিদদের পোষা পোকা-ধরা, বখাটে-মাস্তান পাড়া-মহল্লা-গঞ্জে যত প্রকার অসামাজিক অকাম-কুকাম আছে তা করছে আর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও দেখার কেউ নেই! বাধা দিলেই আপনার জীবন ও জীবনী দুটোই শেষ। এ আমাদের সমাজদর্পণ। এর মহড়া আপনি প্রতিনিয়ত রুপালি পর্দায় (টিভির পর্দায় এবং পত্রিকা খুললেই) দেখবেন। শিক্ষার পরিবেশ, মানুষের মতো মানুষ হবার স্বপ্ন, নীতিকথা, সামাজিক ন্যায়বিচার অশুভ শক্তির প্রচণ্ড দাপটে, ভয়ে উধাও হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। অনেক অভিভাবককে বলতে শুনেছি, তাঁরা খারাপ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার কাজে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। শিক্ষার সামাজিক উপকরণ কোথায়! সামাজিক পরিবেশকে খারাপ করে দিয়ে এককভাবে শিক্ষার উন্নয়ন হয় না।

ম্যানেজিং কমিটি বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে গাঁড়ের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্ষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভক্ষক। আবর্জনা যেখানেই রাখা হোক দুর্গন্ধ ছড়াবেই। রাজনীতি যেহেতু পচে গেছে, কোনো শিক্ষিত লোক আর নিজেকে নতুন করে রাজনীতিতে জড়াতে চাচ্ছেন না। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফলে সত্যের পক্ষে কোনো সুশিক্ষিত ব্যক্তি প্রতিবাদও করতে এগিয়ে আসছেন না। স্থানীয় রাজনীতির নেতারা কমিটিতে ঢুকছে, আর বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। শকুন যত উপরেই উঠুক না কেন, চোখ যেমন নীচের দিকে পড়ে থাকে, তেমনি অধিকাংশ কমিটির ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের চোখ থাকে দলবাজি ও অর্থকড়ির দিকে। পত্রিকায় বার-বার একই

খবরের পুনরুক্তি হয়। স্মৃতিকে বার-বার জাগিয়ে দেয়। তবে ঘটনা যতই ঘটুক, এ সর্বনাশা ও শিক্ষানাশা স্রোত বন্ধ হয় না। মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যাকাণ্ডের মতো আরো শতেক ঘটনা যখন প্রকৃতির অনিবার্য কারণে সামনে বেরিয়ে আসে, তখনই আরো আরো শত-সহস্র শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতির প্রখর-তেজদীপ্ত আলোয় চোখে ঝাপসা দেখি। এগুলো জেনে, শুনে, গুনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং অন্যায়, অত্যাচার বিষয়গুলো গা-সওয়া হয়ে গেছে। এ নিয়েই আমাদের জীবন ও সংসার, নিত্য বসবাস। শিক্ষার উন্নতির জন্য এ নীতিমালার সমূলে উচ্ছেদ অনিবার্য। এলাকার ঘরবদ্ধ আলোকিত জনগোষ্ঠী দিয়ে প্রতিটা ম্যানেজিং কমিটি হবে। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের এখানে সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। স্থানীয় রাজনীতিবিদদের অশুভ হাতের ইশারা দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে রামরাজত্ব কায়েম করতে গেলেই শিক্ষার পরিবেশ শেষ হয়ে যাবে। 'যত পারিস করেকম্মে খা আর আমার নামে জয়-কীর্তন গা'– ভাব পরিহার করতে হবে। আবর্জনার দু-পিঠেই গন্ধ। যে পাত্রেই রাখবেন, পাত্রটা পর্যন্ত গন্ধময় করে তুলবে।

প্রযুক্তিগত পরিবেশ ছাড়া বর্তমান ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতা অচল। কথায় আছে, 'হাতিয়ারে কাজ করে, মরদের নাম হয়।' বর্তমান কর্মের হাতিয়ার প্রযুক্তি। যে সমাজে প্রযুক্তির ব্যবহার যত বেশি, সে সমাজ তত সমৃদ্ধ। শিক্ষাঙ্গনে যেখানে যতটুকু দরকার প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে ও শেখাতে হবে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায়– এমনকি কওমি মাদ্রাসাতে বর্তমান টেকনোলজির সুবিধা দিতে হবে ও সুবিধাকে সচল রাখতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ একটা বিষয়। এ দেশের অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসাতে গণহারে শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে অগণিত ছাত্রছাত্রীকে একসাথে পাঠদান করা হয়। দেখার কেউ নেই, বলারও কেউ নেই। এতে বাড়িতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীকে বেশি বেশি পড়তে হয় কিংবা হাউস-টিউটরের কাছে না পড়ে উপায় থাকে না। এভাবে চলতে চলতে হাউস-টিউটরের কাছে পড়া বাধ্যতামূলক ও অবশ্যম্ভাবী একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে বা বলা যায় হাউস-টিউটরের ভূমিকা স্কুলে পড়ার তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে স্কুলের পড়া স্কুলেই

শিখিয়ে দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে বেশি সময় ধরে রাখতে হবে। পড়া আদায় করে নিতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা সহপাঠীদের সাথে একসাথে বসে পড়তে উৎসাহিতও বোধ করবে। প্রয়োজনে অল্পস্বল্প বাড়ির কাজ দেওয়া যেতে পারে। এজন্য শ্রেণিকক্ষে প্রতিটা সেকশনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বড়জোর ৩৫ জনের বেশি হতে দেওয়া যাবে না। শিক্ষকরা ক্লাসেই শেখাবেন, ক্লাসেই পড়াটা যথাসম্ভব আদায় করে নেবেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসশিক্ষায় মনোযোগী হবে এবং হাউস-টিউটরের প্রতি নির্ভরতা ক্রমশই কমবে। শিক্ষকরা চলমান ইন-ক্লাস ইভ্যালুয়েশনের উপর বেশি জোর দেবেন; ক্লাসে পড়াবেন, শেষে ছোট্ট করে একটা পরীক্ষা নেবেন। মোট নম্বরের মধ্যে চলমান ইন-ক্লাস ইভ্যালুয়েশনের ভার বেশি রাখবেন। অর্ধবার্ষিকী কিংবা বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের সাথে চলমান ক্লাসরুম ইভ্যালুয়েশন বছরান্তে তুলনা করবেন। এতে শিক্ষকের কৃতকর্ম ও দুর্বলতাও বের হয়ে আসবে।

সরকার থেকে আরবি, কোরআন-হাদিসসহ কওমি মাদ্রাসাতেও যদি সাধারণ স্কুল-কলেজের মতো বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি কোর্সের পাঠদান বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়, এসব বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়, তখন তো সমসুবিধা দিতেই হয়। এতে পরিবেশেও ভারসাম্য আসবে। সরকার ইচ্ছে করলেই এগুলো পারে। একটা বিষয় সত্য যে, আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার মৌলভি-মাওলানাদের যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয়, জীবনের বাস্তবতা যদি বুঝতে পারেন, প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী-সমাজের বড় একটা অংশের মেধাকে যদি অঙ্কুরে বিনাশ না করে দিয়ে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ করে দেন এবং সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাথে সুস্থ প্রতিযেগিতায় নামেন, আমি নিশ্চিত তাঁরা এতে সার্থক হবেন। সেক্ষেত্রে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী কিন্তু সেখানে ভর্তি হবার জন্য আগ্রহী হবে, যাদের সাধারণ স্কুল-কলেজে ভর্তি হবার কথা। অনেক বাবা-মাও তাঁদের ছেলে-মেয়েকে উৎসাহভরে একই সাথে ধর্ম ও বিজ্ঞান, ব্যবসায় বিজ্ঞান– সে-সাথে ইসলামি জীবনব্যবস্থা ভালো পরিবেশে শেখানোর জন্য মাদ্রাসা নামের স্কুল-কলেজে পাঠাতে আগ্রহী হবেন। এক্ষেত্রে তাঁদের লেখাপড়ার পরিবেশটা একটু উন্নত করতে হবে। ক্যাডেট

কলেজের মতো চৌকস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণি থেকেই চালু করতে হবে। যেসব ছাত্রছাত্রী মাদ্রাসা থেকে বিজ্ঞান বিষয়ের কোর্স নিয়ে পড়বে তাদেরকে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়বে। এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষা বিভাগ ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বড়কর্তাদের আগে মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নীতকরণের বিষয়ে ব্রতী হতে হবে এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের সে-মতো প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অভিন্ন সিলেবাস এবং বোর্ড-প্রশ্নে সকল স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার পরীক্ষা হবে। বাৎসরিক পরীক্ষাও থানাভিত্তিক স্কুল-মাদ্রাসায় অভিন্ন প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার মান নিয়ে জনমনে যে অবমূল্যায়নের মানসিকতার জন্ম নিয়েছে, তা দূরীভূত হবে। মানসিকতার সুষ্ঠু উন্নয়ন মানেই প্রতিটা ক্ষেত্রের উন্নয়ন। তাঁদের সুমতির উদয় হোক এটা আমার প্রত্যাশা।

এ দেশে শিক্ষার পরিবেশ তখন নেহায়েত মন্দ হবে না! শুভবুদ্ধির উদয় সরকারেরও হতে হবে! কারণ দেশে মাদ্রাসা যে হারে বাড়ছে, বৃহৎ একটা জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল ও বেকার কিংবা ছদ্ম-বেকার রাখাটা আদৌ উচিত হবে না। তাদেরও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, সমাজসেবক, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বায়োলজিস্ট প্রভৃতি শত-শত উচ্চতর পেশায় যাওয়ার পথ করে দিতে হবে। হেফজখানাগুলোতেও কোরআন হেফজের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে এবং হেফজ পড়া অবস্থায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে মূল স্রোতধারায় এসে মিশে যেতে হবে। এটাও একটা সম-পরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ বলা যায়। প্রতিটা দেশেই বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষার যে কোনো দিকে স্বাধীনভাবে যাওয়া যায়, এ দেশে তা নেই। এতো বহুমুখী হ-য-ব-র-ল প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অন্য কোনো দেশে আছে বলে আমার জানাও নেই। ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের পুরোহিতরা (মৌলভি ও মাওলানারা) বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞানকে পরিহার করে শুধু আরবিভিত্তিক যে শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ এ উপমহাদেশে চালু করেছিলেন, বর্তমান বাঙালি মুসলমানরা জাতি হিসেবে সে অদূরদর্শিতার কুফল এখনো বয়ে বেড়াচ্ছেন।

জানিনে, এ রেশ আর কতদিন বইতে হবে! ভারতীয় মুসলমানরা এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে ডুবেছে এবং ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। নিজ দেশে অন্যের গলগ্রহ হয়ে নির্জীব, শিক্ষাহীন অবস্থায় দিনযাপন করছে– অথচ এখনো চৈতন্যোদয় হচ্ছে না। ইসলামি শিক্ষার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলে তাঁরা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন থেকে অনেকটাই রক্ষা পেতেন। উন্নত জীবন গড়তে পারতেন। সমাজে তাঁদের মূল্য থাকত। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া তাঁদের এই অভিশপ্ত জীবনের মূল কারণ। আমি নিজে টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত। উচ্চশিক্ষায় গবেষণা করতে গিয়ে গবেষণার সুপারভাইজার হিসেবে পেলাম টেকনিক্যাল শিক্ষায় উচ্চ-ডিগ্রিধারী কোরআনের একজন হাফেজকে। তিনি বিভিন্ন দেশে টেকনিক্যাল শিক্ষায় ও ধর্মীয় শিক্ষায় একজন স্কলার হিসেবে ঘুরে বেড়ান। তাঁর কম্পিউটার চালানোর স্পিড ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনার গতি দেখে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসত। এমন সব্যসাচী কিছু শিক্ষিত জনবল এ দেশেও আছে। তবে এ দেশেও মাদ্রাসা শিক্ষা– তথা কওমি শিক্ষার নামে একটা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী আধুনিক সমাজব্যবস্থায় তৈরি হচ্ছে। ইসলামি জ্ঞানসমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষা পেলে এরাও জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে পরিগণিত হতো। উন্নত জাতি গঠনে ধর্মীয় আবেগপ্রবণতার কোনো স্থান নেই। সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের যদি নানামুখী উচ্চশিক্ষা দেওয়া যায়, সাথে সাথে মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অংশ যদি সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে এখনিই ছড়িয়ে দিয়ে পুরো বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুসলমানি-বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক বানানো যায়, তাহলে তা হবে এ উপমহাদেশে বাঙালি মুসলমানদের পুনর্জাগরণ, জাতির টিকে থাকার অবলম্বন, এ-দেশ উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছানোর সোপান। অধিকন্তু মুসলমানি মাজারতত্ত্ব, পিরতত্ত্ব ও পুরোহিতবাদের অবসান; মুসলমান ধর্মের উদারনৈতিক বৈশিষ্ট্য, সাম্যের বাণী, শিক্ষা ও গুণাবলিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা ইসলামিক স্কলার তৈরি করতে চাই– আপাদমস্তক কুসংস্কারে ভরা কবরপূজক-পির, নাচুনে-পির ও তাদের দিগ্‌ভ্রান্ত শাগরেদবর্গ দেখতে চাই না। মাওলানা-মৌলভিরা দেশের শত্রু নয়, তাঁরাও এদেশের সম্মানিত নাগরিক–এটা বুঝতে

হবে। তাঁদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে, ধ্বংস করে ফেলতে হবে, ঘৃণা করতে হবে, দূরে ঠেলে দিতে হবে, শুধু রাজনীতির কাজে ব্যবহার করতে হবে– এটাও কাম্য নয়। তাঁদের বিশ্ব-ইতিহাস শিখতে হবে; বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান পড়তে হবে; নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বন্ধ করতে হবে; কথা ও কর্মে উদারতা বাড়াতে হবে; ধর্মব্যবসা ছাড়তে হবে; ধর্ম ছাড়াও একটা জীবনমুখী কাজকে পেশা হিসেবে নিতে হবে; জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতধারায় মিশে যেতে হবে; সৃষ্টির সেবা করতে হবে– এটা কাম্য।

এ দেশের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ছিয়াশি ভাগ যেহেতু মুসলমান, বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নয়ন অবান্তর ধারণা। ইসলাম ধর্মে কোনো জাতভেদ, সাম্প্রদায়িক বিভেদ নেই– সকল মানুষ সমান, মানবিকতার মুক্তি, একই কাতারবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়ে; বিয়ে-শাদিতে, আচার-অনুষ্ঠনে কোনো জাতভেদ নেই। সুতরাং দেশ হতে হবে ধর্ম-বিভেদহীন, প্রতিহিংসামুক্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। অন্য ধর্মের শিক্ষার্থীরাও নিজ নিজ ধর্ম, মানবতা, সহনশীলতা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা একই সাথে স্কুলে শিখবে, চর্চা করবে, সমান তালে এগিয়ে যাবে। প্রতিটা ধর্মেরই মূল কথা যেহেতু ধর্মীয় অহিংসতা, যার যার ধর্ম তার তার, ধর্মে কোনো বাড়াবাড়ি নেই; তাই দেশ হবে অহিংস ধর্মের দেশ। এ দেশ সকল ধর্মের, সম্প্রদায়ের, গোষ্ঠীর জন্য সমান। রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই। রাষ্ট্রের কাছে সকল ধর্ম সমান। এ-মন্ত্র ও শিক্ষা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উন্নয়ন ও উৎকর্ষের মূলমন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জনগোষ্ঠীর আত্মিক ও মানসিক কাঠামোর উন্নতি হলে তার সুপ্রভাব রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলেও পড়বে। এভাবে মডেলে উল্লিখিত শিক্ষার উপকরণের ক্রমোন্নতি হবে। ক্রমোন্নতি হবে শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমেরও। একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার, শিক্ষার পরিবেশ যত খারাপ হবে শিক্ষার মান তত কমে যাবে। আবার শিক্ষার মান যত খারাপ হবে শিক্ষার পরিবেশসহ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ তত নিম্নমুখী হবে। এটা একটা ভিশাস সার্কেল। এর রাহুগ্রাস থেকে বেরিয়ে আসা অনেক কঠিন।

পাঁচ: শিক্ষাপদ্ধতি

শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার একটি মূল্যবান বিষয়। শিক্ষা দিতে গেলে কোনো-না-কোনো একটা পদ্ধতি বা মিশ্রণ পদ্ধতি এবং তার উপকরণ ব্যবহার করতেই হয়। বাস্তবে 'ব্লুমস্ ট্যাক্সোনমি' বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার জন্য ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিলেও এত মাপজোখ করে কোথাও তেমন একটা প্রয়োগ করা হয় না। শিক্ষক তাঁর নিজের মতো করে একভাবে পড়ান। অবশ্য প্রতিটা বিষয়ে 'ব্লুমস্ ট্যাক্সোনমি' অনুসরণ করে পড়ানোর প্রয়োগযোগ্যতাও থাকে না। কারণ বিভিন্ন বিষয় শেখানোর উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই সব ক্ষেত্রে একই পথের অনুসরণ সম্ভব হয় না। 'ব্লুমস্ ট্যাক্সোনমি'তে শিক্ষার ছয়টা পর্যায় থাকে। মনে রাখা– শিক্ষার্থীকে তথ্য মনে রাখতে পারতে হবে। বোঝা– শিক্ষার ধারণাটা ব্যাখ্যা করতে পারতে হবে। প্রয়োগ– শিক্ষার্থীর নতুন কোথাও তথ্যটা ব্যবহার করতে জানতে হবে। বিশ্লেষণ– শিক্ষার্থীকে শেখার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতে হবে। মূল্যায়ন– শিক্ষার্থীর শেখার ন্যায্যতা প্রতিপাদন (জাস্টিফাই) করতে পারতে হবে। সৃষ্টি– শিক্ষার্থীর শেখার একই রকমের নতুন কোনো জিনিস বা ধারণা সৃষ্টি করতে পারতে হবে। এর প্রতিটা পর্যায়েরই অনেক লম্বা-চওড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে। এছাড়া 'আউটকাম বেইজড এডুকেশন' নামের শিক্ষাপদ্ধতিও এদেশে ক্রমশই বিস্তার লাভ করছে। আমি কোনো পদ্ধতির দোষ-গুণ বিচার করার জন্য এ আলোচনায় বসিনি। প্রতিটা পদ্ধতিরই অনেক ভালো ভালো দিক আছে। আমি আলোচনা করতে চাই প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে। এ দেশে যে কোনো পদ্ধতির প্রয়োগযোগ্যতা নিয়েই আমার প্রশ্ন আছে, বাস্তবতা তাই বলে। শিক্ষকরা যত প্রশিক্ষণই নিচ্ছেন, কাজে খাটাচ্ছেন না বা শিক্ষার্থী সে-পথে শিখছে না। শিক্ষার্থীরা বা কোচিং সেন্টারের কুশীলবরা তার একটা বিকল্প সহজ পথ বের করে ফেলছে। সমস্যাটা এখানেই। একটা অধ্যায় পড়ে কতটুকু শিখলো তা জানার জন্য এমসিকিউ প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীরা সহজে সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য পাঠ্যবই না পড়ে গাইডবই থেকে বেশ কিছু প্রশ্নের সঠিক উত্তর মুখস্থ করে রাখছে। মুখস্থের বাইরে কিছু এলে ইচ্ছেমতো একটাতে

টিক দিয়ে রাখছে। বাবার নাম কী জানার জন্য একটা প্রশ্নে চারটে উত্তর লিখে দিলেন। চারটের একটাও মায়ের শেখানো নামের সাথে মিললো না। সে কোনো মন্তব্য না লিখে টিক না দিয়ে চলে এলো। আবারও সেই মুখস্থবিদ্যা। বই পড়ে শিখতে, জানতে, বিষয়টা বুঝতে, ভাবতে অনভ্যস্ত, অনীহ। খুন স্বীকার তবু বইয়ের অধ্যায়টা পড়ে বুঝতে ও ভাবতে স্বীকার না। শিক্ষকও মুখস্থ করিয়েই সন্তুষ্ট। আমার মনে হয় 'সৃজনশীল পদ্ধতি'ও 'ব্লুমস্ ট্যাক্সোনমি'র উপর ভিত্তি করে এ দেশে চালু হয়েছিল, যা বাজারে নোট ও গাইড-বইয়ের আধিক্যে ও প্রভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে চলেছে। মূলত অনুকূল পরিবেশ না পেলে যে কোনো ভালো পদ্ধতিও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখানে একটা বিষয় শিক্ষকরা করতে পারেন, ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসরুমে বসিয়ে পড়া শেখাতে পারেন। যা-ই চোখ দিয়ে দেখে পড়ুক না কেন, মন দিয়ে দেখবে ঘটনার বাস্তবতা। পড়ার সাথে সাথে বাস্তবে মনে তা ভিজ্যুয়ালাইজ করবে। প্রতিটি বিষয় পড়ার সাথে সাথে মনে মনে মেলাবে বাস্তবতার সাথে। যে ছেলেমেয়ে পড়াটাকে বাস্তবের সাথে ভালোভাবে মেলাতে পারবে, তার পড়ার ফলপ্রসূতা তত বেশি হবে। এটা অভ্যাসের ব্যাপার। এতে ছেলে-মেয়ে বইতে যা পড়বে তা-ই বাস্তবে ব্যবহার করতে পারবে। এটাকে কোনো পদ্ধতি না বললেও বাস্তব শিক্ষার একটা টেকনিক বলা যায়। আমি নিজে এটা প্রয়োগ করে দেখেছি, ভালো ফল পাওয়া যায়। এতে অন্ধের মতো বই মুখস্থ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এছাড়া শিক্ষকরা ক্লাসের পড়া বোঝাতে গেলে প্রতিটা ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবন থেকে উদাহরণ দেবেন। ছাত্রছাত্রীদের আরো নতুন উদাহরণ দিতে বলবেন। এতে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণতা আসবে।

না-শিখে উত্তর দেওয়ার সহজ কৌশল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনেক ব্যবস্থাই নেওয়া যেতে পারে। তার আগে অর্থাৎ ছাত্র পড়ানোর আগে শিক্ষক তৈরি করা দরকার। শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীকে না-শিখিয়ে নম্বর বেশি দেওয়ার মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অনেক শিক্ষকই অভিভাবকমহল ও শিক্ষা-ব্যবস্থাপকের হাত থেকে পিঠ বাঁচানোর জন্য, কখনো টিউশনিতে বেশি ছাত্রছাত্রী জোগাড়ের জন্য অ-শিক্ষকসুলভ অনেক কিছুই করেন। প্রতিষ্ঠান-প্রধান এবং

সংশ্লিষ্ট কমিটিকে এ বিষয়গুলো চোখে চোখে রাখতে হবে। আসলে বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে গভর্নিং কমিটি তৈরি করা হচ্ছে– সেখানেই সমস্যা রয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশেরই শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই– লেখাপড়া ভালো জানে না, প্রভাবশালী রাজনীতির লাঠিয়াল বাহিনীর নেতা বা সদস্য। জীবনে লেখাপড়া কোনোদিন করেনি, লেখাপড়া নিয়ে ভাবেনি। শিক্ষাঙ্গনের কমিটিতে রাখা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটাকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কিংবা শিক্ষাঙ্গনের অর্থকড়ির সুগন্ধ শোঁকার জন্য। তারা শিক্ষাঙ্গনে এসে অভ্যাসবশত শুধু দলাদলি করে, রাজনীতির দাপট দেখায়, অযোগ্য দলীয় লোককে পক্ষপাতিত্ব করে পদে বসায়, কখনো টাকার বিনিময়ে অযোগ্য লোককে নিয়োগ দেয়, নোংরামি করে– শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা বোঝে না, শিক্ষাঙ্গনের বারোটা বাজায়। চিরমহান নেতারা জেগে ঘুমায়। হেডমাস্টার টিকে থাকার জন্য কিংবা ভাগ-বাটোয়ারায় অংশ নেওয়ার জন্য কমিটির আনুগত্য করে, কখনো অতি উৎসাহী হয়ে রাজনৈতিক দলে যোগ দেয় ইত্যাদি। শিক্ষাঙ্গন জাত শিক্ষকদের হাতে থাকা দরকার। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ আছে– তারা দেখবে, তদারকি করবে। মূলত শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে, কায়েমি স্বার্থবাদী-গোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত করতে হবে।

প্রতিটা উপজেলাতেই বেশ কয়েকটা কলেজ থাকে, সেখান থেকে কিছু সিনিয়র শিক্ষক বা অধ্যক্ষকে প্রাইমারি ও হাই স্কুলের কমিটিতে রাখা যায়। এছাড়া এলাকার কিছু সুশিক্ষিত ও দলবাজমুক্ত লোকদেরও কমিটিতে রাখা যায়। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতির কথা ভেবে কাজ করবেন। আমরা পুরো সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক কলুষতা, কুটিলতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলবাজির নোংরা ও বিষাক্ত বীজ ব্যাপকভাবে বুনে দিয়েই-না দেশের সার্বিক সামাজিক অস্থিরতা, হানাহানি, উদগ্র স্বার্থান্ধতা, মাস্তানি ও অব্যবস্থাপনার পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছি। সমাজে সুস্থ চিন্তা করার লোক ঘরে ঢুকে বসে আছেন– বাইরে সামাজিক কোনো কাজে নিজেদের জড়াতে চাচ্ছেন না। অর্থনীতির সেই পুরোনো তত্ত্ব– খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে বের করে দেয়, এক্ষেত্রেও তা সত্যে পরিণত হয়েছে। সমাজকে বিকৃত করা, মানুষকে কুপথে নেওয়া, সামাজিক

পরিবেশ নষ্ট করা সহজেই সম্ভব; কিন্তু আবার ভালো পথে ফিরিয়ে আনতে হলে বড়কর্তাদের অনেক ত্যাগ, সদিচ্ছা, দূরদর্শিতা ও সময়ের প্রয়োজন। অনেক কাঠ-খড়ি পোড়াতে হবে। তবে মানুষের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।

ভালো সুস্বাদু ভাত খেতে চাইলে যেমন আগেই ভালো উন্নত জাতের ধান সংগ্রহের প্রয়োজন– তারপর মরা-চালমুক্ত সরু-চিক্কণ চাল, তারপর সুস্বাদু ভাতের জোগান পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি সুশিক্ষার আলো জ্বালতে শিক্ষাঙ্গনে আগে সুশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন। এ দেশেই এঁরা আছেন। তাঁদেরকে ভালো পরিবেশ ও পেট-চলার-মতো সম্মানী দিয়ে আনতে হবে। শিক্ষাঙ্গনের উপযোগী করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণমতো কাজ হচ্ছে কি না, তা তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের দলে দলে বড় বড় শহরে না পাঠিয়ে প্রশিক্ষককেই শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োজনীয় সময় রেখে ছুটির দিনগুলোতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এলাকাভিত্তিক ক্লাসটার প্রশিক্ষণের কথা ভাবা যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের বোঝা যতটা কমানো যায় ততই ভালো। পঞ্চম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া আরো ভালো। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় ধরে রাখতে হবে। প্রয়োজনে দু-বার টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে। সকাল সকাল ক্লাস শুরু করতে হবে। বাড়িতে গিয়ে পড়ার ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। বাড়ির জন্য কিছু 'বাড়ির কাজ' প্রয়োজনে দেওয়া যেতে পারে। স্কুলের পড়া স্কুলেই শেখাতে হবে। ক্লাসেই চলমান মূল্যায়ন করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েই মহাপণ্ডিত বানিয়ে ফেলার চেষ্টা সংযত করতে হবে। অক্ষর চেনা, শব্দ তৈরি করা, বাক্যগঠন করতে শেখার কাজগুলো যাতে ভালো পারে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। সামাজিক আদব-কায়দা, বড়দের প্রতি সম্মান দেখানো, প্রতিবেশীর প্রতি ব্যবহার, সত্য কথা বলা, থুতু ফেলা, টয়লেট ব্যবহার করা, মা-বাপকে সম্মান করা, সমাজ ও পরিবেশকে জানা, স্বাস্থ্যসচেতনতা ও আচরণ শেখানো, খারাপ পরিবেশে না মেশা, অন্তত ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত মোবাইল ফোনের ব্যবহার না করতে দেওয়া, অঙ্কের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ জানা প্রভৃতিসহ জীবনের মৌলিক নীতিকথা ও দেশীয় মূল্যবোধ এবং শিক্ষা-

আদর্শের বীজ ক্রমশ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মনের অন্তস্তলে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারা খেলাধুলা এবং ব্যবহারিক কাজের মধ্য দিয়ে এগুলো শিখবে। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে, মূল্যবোধ এবং নীতিকথা মুখস্থ করিয়ে হয় না। এগুলো বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে, বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে মনের মধ্যে গেঁথে দিতে হবে। শিশুমনে নীতিকথা ও দেশীয় মূল্যবোধের যে সত্যানুরক্ত-বীজ ক্ষোদিত করে দেওয়া হবে, তা আজীবন রয়ে যাবে এবং জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। পঠিত বইগুলোর দ্রুতপঠন এবং ভালো লিখতে পারার দিকে জোর দিতে হবে। কিছু একটা পড়ে সেটা বুঝতে পারে কি-না, দেখতে হবে। প্রয়োজনে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং তার কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে হবে। প্রতিটা শিক্ষকের শিশু-মনোবিজ্ঞানের উপর দখল থাকতে হবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ভিত্তিমূলগুলো মজবুত করার প্রকৃষ্ট সময়। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। স্কুলেই লেখাপড়ার মূল কাজটা করতে হবে। সকাল ন'টা থেকে স্কুল শুরু হবে, বিকেল চারটে বা সাড়ে চারটে পর্যন্ত চলবে। প্রত্যেক পিরিয়ডের মাঝে দশ মিনিটের বিরতি দিতে হবে। দুপুরে এক ঘণ্টার লাঞ্চ-বিরতি। বাড়ির-কাজ দেওয়া যাবে কিন্তু মুখস্থ করার কোনো বিষয়ে বাড়ির-কাজ দেওয়া যাবে না। প্রতিটি অধ্যায় শেষে ক্লাসে বসিয়ে ইন-ক্লাস-অ্যাসাইনমেন্ট করিয়ে নিতে হবে। ইন-ক্লাস-অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর যেন কোনো নোটবই বা গাইডবইতে না পাওয়া যায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। প্রথমত, দৃশ্যমান বিষয়ের উপর এবং ধীরে ধীরে অদৃশ্য বিষয়ের উপর লেখা শেখানোর চেষ্টা করতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষা দিয়ে সে নিজে লিখবে। সব কিছুতেই শিক্ষকের গঙ্গামুখো পা দিয়ে বসে না থেকে ছাত্রছাত্রীদের শেখানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। শেখানোর প্রস্তুতি নিতে হবে। পড়া শেখাতে হবে। পড়া মানে শুধু পড়া নয় তা বলেছি। লেখা মানেও আমাদের সময়ে কয়েকটা বাংলা কিংবা ইংরেজি রচনা মুখস্থ করিয়ে লিখতে বলা হতো– তাও নয়। নিজের মন থেকে তৈরি করে লেখা, নিজের বুঝ দিয়ে লেখা। বর্তমান বাংলা ও ইংরেজির সিলেবাস আমি দেখেছি, অনেক ভালো। শেখার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তবু আমরাও শেখানোর মতো শেখাই না, ছাত্রছাত্রীরাও না শিখেই

পার পেয়ে যায়। বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রতিদিন যদি একজন শিক্ষক দৈনিক খবরের কাগজ হাতে করে ক্লাসে যান, বিভিন্ন খবর ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়তে বলেন, পড়ে কী বুঝলো বলতে বলেন, ক্লাসের পর্যায় বুঝে খবরটা বিশ্লেষণ করতে বলেন, সমস্যাটা ছাত্র/ছাত্রীর দৃষ্টিতে কীভাবে সমাধান করা যায় তা বলতে বলেন– তাহলেই পড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। আমরা তো শিক্ষার্থীর মধ্যে সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা, বিশ্লেষণ সক্ষমতা, 'বাংলা ও ইংরেজির দক্ষ ভাষাজ্ঞান' দেখতে চাই। এগুলো মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে উপযুক্ত পদ্ধতির প্রয়োগে শেখাতে হবে। কোনো ক্লাসের বই থেকে একটা টপিক পড়িয়ে কী শিখলো সারকথা ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসেই জিজ্ঞেস করা যায়। নিজের ভাষায় লিখতে বলা যায়। এতে নোটবই মুখস্থ করার অভ্যাস দূরীভূত হয়। ছোট ছোট আকারের অনেক প্রশ্ন করা যায়, যার উত্তর দু-পাঁচ লাইনের বর্ণনাতে হবে। ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শেখানো, সেই ক্লাসেই মূল্যায়ন। নোটবই ক্লাসে না আনতে দেওয়া। এমনভাবে পড়ানো ও মূল্যায়ন করা যাতে নোটবইয়ের প্রয়োজন না হয়। নোটবই বিক্রি না হলে ব্যবসায়ীরা ক্রমশ নোটবই ছাপানো বন্ধ করে দেবে। আইন করে নোটবই ছাপানো বন্ধ করতে গেলে ছাপানো তো বন্ধ হবেই না, অন্য কোনো না কোনো পক্ষের বাড়তি রোজগার আরো বাড়বে। অতিরিক্ত টাকাটা অভিভাবকের পকেট থেকে যাবে।

ক্লাসের চলমান মূল্যায়নই বাৎসরিক পরীক্ষার ফল হওয়া উচিত। প্রত্যেক শিক্ষকের প্রতিটা ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশক গাইড হওয়া উচিত। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা নেই বললেই চলে– এটি জাগাতে হবে। গণিত শেখানোর পাশাপাশি গণিতের প্রায়োগিক দিকের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই কম্পিউটারের ব্যবহার শেখাতে হবে। প্রত্যেক স্কুলে কম্পিউটারের-ল্যাব থাকবে। শিক্ষার ধর্মীয় ও মানবিক গুণাবলিও ব্যবহারিকভাবে কাজ ও ভাবনার মাধ্যমে শেখাতে হবে, যাতে একজন মানুষ লেখাপড়া-জানা বুদ্ধিমান চোর-ডাকাত না হয়। ধর্ম শিক্ষার নামে 'ঈমান কত প্রকার ও কী কী নিজের ভাষায় লিখ'; 'নামাজ কত প্রকার ও কী কী বুঝাইয়া লিখ' মুখস্থ না করিয়েও শেখানোর অনেক ব্যবস্থা

আছে। সততা, মানবিকতা, আদর্শজীবন, সুনাগরিক হওয়া, সময়জ্ঞান, সাম্যের বাণী, প্রতিহিংসা-মুক্ততা, কর্তব্যপরায়ণতা, দেশাত্মবোধ, সত্যের প্রতি আনুগত্য, মিথ্যা-শঠতা-চৌর্যবৃত্তিহীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবসমৃদ্ধ কথা ব্যাপকভাবে শিখিয়ে চিন্তা ও চর্চার মাধ্যমে মনের গহিনে চিন্তাশক্তিতে প্রথিত করতে হবে। বিভিন্ন মনীষীর জীবন আলোচনা ও চর্চার মধ্য দিয়ে বাস্তবে বিবেককে জাগিয়ে তুলতে হবে। ন্যায়নিষ্ঠা অন্তর দিয়ে অনুভব করাতে হবে ও চর্চা করাতে হবে। এগুলো শেখানোর জন্য বর্তমান টেকনোলজির যুগে অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক 'ডকুমেন্টারি ফিল্ম' পাওয়া যায়। এগুলোর মাধ্যমে শিশু ও কিশোর ছাত্রছাত্রীদের মনে ভালো কাজ করার ও নিজে ভালো হওয়ার উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা যায়। বই পড়ার অভ্যাস নেই বললেই চলে– গড়ে তোলা যায়। নিয়মিত বই পড়ার প্রতিযোগিতা করানো যায়। ভালো কাজের কল্পনা ও সুস্থ চিন্তা কীভাবে করতে হয়, শেখানো যায়। ইংরেজি ও বাংলায় 'সময়ের মূল্য' রচনা মুখস্থ না করিয়ে বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণ দিয়ে ছাত্রছাত্রীকে সময়জ্ঞানে অভ্যস্ত করে তোলা যায়। ক্লাসশিক্ষার মধ্যে জীবনের মানকে কল্পনায় উন্নীত করা যায়, চিন্তাধারাকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। দরকার 'পার্টিসিপেটিভ টিচিং-লার্নিং সিস্টেম', বয়সভেদে ক্লাসরুম সেমিনার ও ওয়ার্কশপ। শিক্ষাদানের মধ্যে সবসময় বুদ্ধি করতে হবে, যেন ছাত্রছাত্রীদের নোটবই ও গাইডবইয়ের দ্বারস্থ না হওয়া লাগে। ছাত্রছাত্রীরা যেন নিজেই কিছু ভাবতে শেখে, নতুন কিছুর ধারণা নিজেই সৃষ্টি করতে পারে; সৃষ্টিধর্মী মনোভাব গড়ে ওঠে ও মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। কয়েক বছর এভাবে চললে নোট ও গাইডবইয়ের ব্যবসা এমনিতে বন্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরাও জ্ঞানার্জনে ব্রতী হবে। শিক্ষকদের টিউশনি-কোচিং ব্যবসা বন্ধ করাতে হবে। ক্লাসের পড়া যদি ক্লাসেই শেখানো যায় এবং চলমান মূল্যায়ন করা হয়, ছাত্রছাত্রীকে অধিক সময় ক্লাসে রাখা যায়– তখন টিউশনি ও কোচিং ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যায়। সবকিছুই জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে, পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুনের উন্নতি করে এবং তা যথাযথভাবে মেনে বিদ্যমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করা ভালো। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, অষ্টম শ্রেণি শেষে নিম্নমাধ্যমিক পাসের সার্টিফিকেট পেতে গণহারে কোনো পাবলিক পরীক্ষার আয়োজন দরকার নেই বলে আমার

বিশ্বাস। এতে সরকারের এবং ভুক্তভোগী পক্ষের প্রচুর ব্যয় সাশ্রয় হবে ও ভোগান্তি দূর হবে। আবার শিক্ষার মান হারানোরও তেমন কিছু নেই। স্কুল-মাদ্রাসার পরিবেশ, শিক্ষার মান এবং নিবিড় তদারকি বাড়াতে পারলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল-মাদ্রাসার পরীক্ষাই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। মূল কথা হলো, শিক্ষা থেকে টিউশনি ও কোচিং-ব্যবসা শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করে দূর করতে হবে। যে কয়টা বৈশিষ্ট্য/ভিত্তিমূল শিক্ষার মধ্যে বা শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকতেই হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে এবং শেখানোর সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। জাতীয় এবং সামাজিক উন্নতির জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

এতক্ষণে এ দেশের উপযোগী একটা শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। যদি প্রশ্ন করা হয় এদেশে বারবার এত শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন হচ্ছে কেন? একটাই উত্তর, শিক্ষা না দিয়ে অতি সহজে ছাত্রছাত্রীকে পাশ করিয়ে দেবার বিকৃত কৌশল এদেশের শিক্ষকদের মাথার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাথায় ঢুকেছে বলে। কেন এটা ঢুকলো? প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারের আধিক্যের কারণে। এতে কী হয়েছে? দিনে দিনে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পাঠভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। ফলে শিক্ষা মানের অবনতি ঘটেছে। দেশের সর্বগ্রাসী পতন শুরু হয়ে গেছে। এর থেকে নিস্তার পাওয়ার কৌশল কী? কঠিন কিছু না, অভ্যাসের বদল করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা না শিখে, না বুঝে মুখস্ত করার সহজ বুদ্ধি ছাড়তে হবে। প্রয়োজনে বাধ্যতামূলকভাবে অভ্যাস বদল করাতে হবে। এই অভ্যাসটুকু বদল করার জন্য সাধারণ মানুষের পকেট (বাজেট) থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার কোনো মানে হয় না। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা পদ্ধতি' (পার্টিসিপেটিভ টিচিং-লার্নিং সিস্টেম) এদেশে ব্যবহার করতে হবে। এ পদ্ধতি তেমন কঠিন কিছু নয়। অবশ্য এদেশের বেশ কিছু শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজ থেকেই এ পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছেন। এ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, যা শিক্ষক অবশ্যই অনুসরণ করবেন। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য ও তাদের মেধা খাটানোর জন্য বিভিন্ন

ব্যবস্থা নিজের মতো করে নেবেন। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় নিযুক্ত রাখবেন। দু-পক্ষীয় আলোচনা হবে। ছাত্রছাত্রীকেই মেধা খাটিয়ে সমস্যার সমাধান বের করার কথা বলবেন। তাদের দেওয়া সমাধানটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। শেষে শিক্ষক পরিশীলিতভাবে সমাধানটা করে দেবেন। শিক্ষক একমুখী বক্তৃতা দিয়ে যাবেন, এ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্নভাবে শেখায় অংশগ্রহণ করাবেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করবেন ও মনোযোগ ধরে রাখবেন। প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্ন করবেন; কি বুঝেছে বলতে বলবেন এবং অন্য ছাত্রছাত্রীকে শুনতে বলবেন। প্রত্যেক শিক্ষকের পড়ানোর একটা নিজস্ব আর্ট আছে নিশ্চয়ই। শিক্ষকতাও একটা আর্ট। শিক্ষক প্রতিটা ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কর্মের মাধ্যমে আকর্ষণ করবেন। সব শিক্ষক যে একই পথ অনুসরণ করবেন এমনটি করার পক্ষপাতি আমি নই। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্নভাবে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে অংশগ্রহণ করাতে পারেন। এ বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন টেকনিক বিভিন্ন লিটারেচারে (এমনকি ইন্টারনেটেও) উল্লেখ আছে। শিক্ষক তার মনমতো একটা অথবা একাধিক টেকনিক মিলিয়ে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারেন। এ বিষয়ে আমি শিক্ষকদের স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতি। তবে আমাদের দেশে 'আউটকাম বেইজড এডুকেশন' এবং 'ব্লুমস ট্যাক্সোনমি' নামে যে পদ্ধতিগুলো বিভিন্ন সরকারি নিয়ন্ত্রক ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অনেক টাকা খরচ করে বাস্তবে প্রয়োগ করতে চাচ্ছে, তা সহজে বাস্তবায়ন হবার নয়। যুগ যুগ কেটে যেতে পারে।

সৃজনশীল পদ্ধতিও ছিল ব্লুমস ট্যাক্সোনমিতে উল্লিখিত শিক্ষার ছয়টি ধাপের মধ্যে তৃতীয় ও ষষ্ঠ ধাপ। কঠিন কিছু নয়। সেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। তাও আমরা পাঠ শেখার পরিবর্তে মুখস্ত করাতে চেষ্টা করেছি। হুজুগে বাঙালি যেদিকে ধায়, সর্বস্বান্ত করে ফেলে, তবু হুঁশ ফেরে না। জানা, শেখা, বুঝতে পারা ও শেখাটা বাস্তবে প্রয়োগ করা ('ব্লুমস ট্যাক্সোনমি'র মূল কথা) সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চালাতে পারলেও আমাদের দেশে অকেজো বলে আমরা প্রমাণিত করেছি। বিদেশী কোনো ক্যাপস্যুল পেলে আমরা লুফে নিয়ে খেতে শুরু করে দিই। লাভ-লোকসান, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, রোগের ধরন বিবেচনা করা আমাদের

অভ্যাস নয়। বিদেশী ওষুধ বললেই ঝাপিয়ে পড়ি। বাঙালি ছাত্রছাত্রীর মানসিক রোগ, শিক্ষকদের শিক্ষাদানে ব্যবহারিক রোগ, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার রোগ আদৌ বিবেচনা করি না। রোগগুলোর আরোগ্যই যে উন্নতি এটা ভাবতেই পারি না। তাই তো এদেশের শিক্ষা-অপশিক্ষা, নিম্নমানের শিক্ষার ব্যামো কোনোক্রমেই আরোগ্য হচ্ছে না। আগে রোগ নির্ণয়, তারপর ব্যবস্থাপত্র। এদেশের শিক্ষার রোগ একটু ভিন্ন কিসিমের। রোগীর স্বভাবও বিচিত্র। ডাক্তারও রোগাক্রান্ত। আমি বলতে চাচ্ছি, উন্নত দেশের প্রেক্ষাপট এবং আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট কোনোক্রমেই এক নয়। ব্যথাটা আঙুলের মাথায়। ঐ আঙুলের মাথা দিয়ে শরীরের যেখানেই টিপ দেই, শরীরের সেখানেই ব্যথা অনুভূত হয়। ভাবি, সমস্ত শরীরে ব্যথা। আরেকটা বিষয় বলা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশের শিক্ষকদের মান নিম্নমুখী হবার কারণে আমরা কার্যত সৃজনশীল পদ্ধতি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। শিক্ষকরা মুখস্ত করিয়ে অভ্যস্ত। অনেক শিক্ষকই কনসেপচ্যুয়াল প্রশ্ন করতে পারতেন না। কোনো গাইড বই থেকে হুবহু নকল করতেন। সৃজনশীল পদ্ধতির মূল হলো কনসেপচ্যুয়াল প্রশ্ন করা ও আরেকটা প্রশ্নে ঐ শিক্ষা ব্যবহার করে নতুন কোনো জিনিস বা ধারণা সৃষ্টি করতে পারা, যা পারতে হলে শিক্ষকের বিষয়টি সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা থাকতেই হবে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের অধিকাংশ শিক্ষকের শিক্ষামান নিম্ন পর্যায়ের। বিভিন্ন উন্নত দেশে আমি নিজ চোখে, স্কুল-কলেজে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে দেখেছি, এখনোও সেখানে চলছে। অথচ এদেশে তা অচল বলে বিবেচিত। সেটাকে বিভিন্ন অমূলক কারণ দেখিয়ে বাদ দিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির চেয়েও বিশ গুণ অপ্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি নিয়ে আমরা এখন উঠেপড়ে লেগেছি প্রয়োগ করার জন্য। পরিণতি কি হবে আমরা আগাম বলতে পারি। পরবর্তী ছাত্রছাত্রী ও দেশবাসী নিশ্চয়ই বাস্তবে বুঝবেন, ততদিনে নিশ্চয়ই আমার হাড়-মাংস মাটিতে খেয়ে ফেলবে। বলতে পারবো না, তাই আগেই বলে রাখছি। আমরা সমস্যা চিহ্নিত না করে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মতো, কর্তার ইচ্ছেই কর্ম করে থাকি। দেশের মানুষ ও সমস্যার দিকে লক্ষ্য না করে কেউ নিজস্ব বিকৃত ইজম বা কেউ কর্তার ইজম কোমলমতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ওপর চাপিয়ে দেই। সহজ

চিকিৎসাকে এড়িয়ে বিষয়টাকে জটিল করে ফেলি। মূল সমস্যাটা এখানে। এবার টেক্সট বই নিয়ে পরীক্ষার হলে বসে নিজের ভাষায় লেখার একটা কথা শুনতে পাচ্ছি। পদ্ধতিটা বই দেখে লেখার শামিল হবে এবং শিক্ষকরাও নম্বর দিতে বাধ্য হবেন। রাত বারোটার পর দুপুর বারোটা একবার বেজেছে, আবারো রাত বারোটা বাজবে। বাস্তবতা না দেখে ও না ভেবে আমার দিকে হেই হেই করে তেড়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে।

এদেশের নিম্নমানের শিক্ষা-রোগ দেশীয় টোটকা ওষুধ ব্যবহার করে নিঃসন্দেহে নিরাময়ের কথা ভাবা যায়। টোটকা চিকিৎসাগুলো একজায়গায় করলেই একটা পদ্ধতি গড়ে ওঠে। বিদেশী এক ক্যাপস্যুলে সব ধরনের অসুখ যায় না, যাবেও না। এটা আমাদের চোখের সামনে এক ধরনের মরিচিকা। দিন পার করার বুদ্ধি। এটা সর্বরোগের মহৌষধ (প্যানাসিয়া) নয়। রোগের প্রকোপ ও উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করাই ভালো। যাকে বলে, যেমন রোগ, তেমন ওষুধ। দেশের শিক্ষকতায় এখন অসংখ্য অযোগ্য শিক্ষক ঢুকে গেছে, যাদের বিদ্যা ও শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই বললেই চলে। অশিক্ষা তারই পরিণতি। এদেরকে কীভাবে সরাবেন এটা নিয়ে ভাবুন। একজন অযোগ্য শিক্ষক ত্রিশ বছর চাকরি করলে কত হাজারে হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবন নষ্ট হবে, ভেবে দেখুন। প্রথম ইনপুট, তারপর প্রোসেস, সবশেষে আউটপুট। ইনপুট যত ভালোই হোক, প্রোসেস খারাপ রেখে কোনোদিনই ভালো আউটপুট পাওয়া যায় না। অথচ আমরা তা বারবার চেষ্টা করি। আগে পচা-দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা পরিস্কার, তারপর জীবাণুনাশক ওষুধের ব্যবহার। যন্ত্রপাতি নিম্নমানের হলে উন্নতমানের আউটপুট চাওয়া অরণ্যে রোদন।

দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করার কারণে অভিজ্ঞতাটা একেবারে উপেক্ষারযোগ্যও নয়। অল্প কথায় কিছু টেকনিক বর্ণনা করছি, যেগুলো এদেশের শিক্ষার উন্নয়নে ফলপ্রসূ হবে বলে আমার বিশ্বাস। আগে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিকতার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তনের জন্য মূল সমস্যা তো শিক্ষার্থীরা নয়, শিক্ষক ও শিক্ষা-ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত মহারথীরা। শিক্ষক পারে শিক্ষার্থীর মানসিকতার পরিবর্তন করতে। শিক্ষা-

ব্যবস্থাপনার মহারথীরা পারে শিক্ষকদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে। পড়ানোর ধরণ এবং প্রশ্নপত্র তৈরির ধরণটা পরিবর্তন করলেই সব সমস্যার সমাধান। এজন্যই এটাকে আমি পদ্ধতি না বলে টেকনিক বলে অভিহিত করছি। এই টেকনিকগুলো আমি দীর্ঘদিন ধরে নিজেও ব্যবহার করে ভালো ফল পেয়েছি। তার আগে একটা বাস্তব গল্প বলি।

আমার এক আত্মীয় দুর্ঘটনায় পড়ে ব্রেইন হ্যামারেজ হয়। কোনোভাবেই স্মৃতিশক্তি ফিরে পায় না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে সবার মুখের দিতে চেয়ে থাকতো। কিছু খেতে পারতো না। চিবানোর ক্ষমতা নেই, গেলার ক্ষমতা নেই। কোনো বোধশক্তিও নেই। মাথা কাজ করতো না। মুখে কোনো স্বাদ নেই। আমরা তবু তাকে চিকিৎসার চেষ্টা করতে লাগলাম। কয়েকটা খাবার একসাথে করে ব্লেন্ডার মেশিন দিয়ে ব্লেন্ড করে পাইপ দিয়ে পাকস্থলিতে পাঠাতে হতো। কখনো খাবার গলা দিয়ে বের হয়ে আসতো। পেটে ঢোকা খাবারের কিছু অংশ পেটে হজম হয়ে রক্তে মিশে শক্তি উৎপাদন করতো; বাকিটা টয়লেটে চলে যেতো। শরীরটা ক্রমশ রুগ্ন হতে হতে কয়েক বছর পর একদিন চিরদিনের জন্য বিদায় নিলো। আরেকটা গল্প বলি।

আমি তখন বয়সে ছোট। আমার আব্বা আমাদের খুব শাসনে রাখতেন। তিনি কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন। বাড়িতে ইসলামি রক্ষণশীল পরিবেশ। গ্রামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো মাদ্রাসা নেই। আমাকে স্কুলে পাঠানো হলো। যেখানেই থাকি সন্ধ্যার আগে বাড়িতে ফিরে পাশের মসজিদে নামাজ পড়তে হবে। নামাজে গেলে বড় চাচার সাথে দেখা হয়। তিনি মসজিদের ইমাম। অবিভক্ত ভারতের কোনো এক বিখ্যাত কওমি মাদ্রাসা থেকে অনেক লেখাপড়া করেছেন। তিনি আমাদের নিয়মিত ইসলাম বিষয়ে তালিম দিতেন। আব্বাও দিতেন। আব্বা স্কুলের মৌলভি স্যারকে বলে আরবি ও সূরা ভালো করে শেখানোর কথা বলেছেন। তিনি ক্লাসের ধর্ম বই পড়াতে গিয়ে বেশ কয়েকটা ছোট সূরা ও দোয়া মুখস্ত করালেন। তা দিয়ে নামাজ পড়ার কাজটা চলে যায়। বাড়িতে মায়ের প্রেরণায় কুরআন পড়া শিখতে হলো। কোনো অর্থ জানিনে ও বুঝিনে। আগ্রহ বশত সূরা

বাকারাহ ও সূরা ইয়াসীন অনেকদূর মুখস্ত করে ফেললাম। ক্লাস নাইনের আগ থেকে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, তারপর নাইনে এসে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো। তার অনেক আগে থেকেই লেখাপড়ায় আমার অনেক ঘাটতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। বয়সের কারণে, যাকে বলে কৈশোরের বাধনহারা কল্পিত উচ্ছ্বাস-উচ্ছলতায় আমার চোখ তখন রঙিন। পৃথিবীর রঙিন দিকগুলোই শুধু চোখে পড়তে লাগলো। ক্লাসের পড়াতে মন বসতো না। নামাজ পড়াতেও ক্রমশ ভাটা পড়লো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার প্রথম পর্যায় থেকে বড় বোন ও মায়ের চাপে আবার নামাজের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। পরে দেখি সূরা বাকারাহ ও সূরা ইয়াসীনের অনেক জায়গায় একটু একটু ভুলে গেছি। ছোট সূরাগুলোরও কোথাও কোথাও ভুলে গেছি। একদিন মা বললেন, কুরআন ভুলে যাওয়া অনেক গুনাহের কাজ। ভুলে যাওয়া অংশগুলো চেষ্টা করে আবার মেরামত করে নিলাম। কোনো সূরারই অর্থ জানতাম না। শুধু উচ্চারণ করে মুখস্ত বলে যেতে পারতাম। এই সূরা-মুখস্ত ইসলাম ধর্ম শেখার কোনো কজেই লাগতো না। শুধু কুরআনের প্রতি ভক্তি বাড়াতো। ইসলাম সম্বন্ধে যতটুকু শিখেছি ও বুঝেছি, নৈতিকতা ও আত্মসচেতনতা যতটুকু শিখেছি বাপ-চাচাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও মসজিদের ইমামদের জুমআর খুতবার আগে বাংলায় বক্তৃতা থেকে নিজের মগজে অনুধাবন করে ও ভেবে-চিন্তে বুঝে শিখেছি। পরবর্তীতে বই পড়ে শিখেছি। অর্থ-না-জানা সূরা মুখস্ত থেকে ইসলাম বিষয়ে মূলত কিছুই শিখিনি, ইসলাম বিষয়ে কোনো জ্ঞানও বাড়েনি। সূরাগুলো কিছুদিন না পড়লেই ভুলে যায়। যেহেতু অর্থ বুঝিনে, শুধু মুখস্ত-করা সূরা দিয়ে ইসলামকে বিশ্লেষণ করতেও পারিনে, পথ চলতে ইসলামের নির্দেশনাও জানিনে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমার পাঠবিরতি হলো। একসময় এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মন স্থির করলাম। পরীক্ষা দেওয়ার মতো পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা আমার ছিল না বললেই চলে। চোখে অন্ধকার দেখলাম। ছোটবেলা থেকে পারিবারিকভাবে কিছু বই ও প্রতিদিনের পত্রিকা বাংলা ভাষায় পড়াতে বাংলা ভাষার ওপর মোটামুটি একটা দখল ছিল। ইংরেজির ছোট ছোট ট্রানশ্লেশন মোটামুটি করতে পারতাম। অঙ্ক শেখার জন্য দুই মাস এক শিক্ষকের কাছে কয়েকটা অধ্যায়ে প্রাইভেট পড়লাম। জ্যামিতির ৩০ নম্বর পুরো ছেড়ে দিলাম; কারণ অত শেখার সময় আমার

হাতে ছিল না। বাংলা, ইংরেজি বইয়ের গল্প ও কবিতাগুলো মন দিয়ে বারবার পড়ে গল্প ও কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো শিখে নিলাম; সাধারণবিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি টেক্সট বইয়ের অধ্যায়গুলো পুরোপুরি অন্তত চার-পাঁচবার করে মন দিয়ে পড়ে বুঝে নিলাম। প্রশ্ন যেখান থেকে যেভাবেই হোক আমি আমার ভাষায় উত্তর লিখতে সক্ষম। মাত্র তিন মাসের প্রস্তুতিতে কোনো নোট মুখস্ত না করে নিজের ভাষায় লিখে পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হলাম। বুঝলাম, বই পড়ে যদি মূল বিষয়গুলো বুঝে নেওয়া যায় আর লেখার মাধ্যমে নিজের জানা বিষয়গুলো প্রকাশ করার যদি সক্ষমতা থাকে, যে কোনো পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হওয়া ও যে কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা কঠিন কিছু নয়। অঙ্কের জন্যও মেধার চর্চা করি, কিছু টেকনিক খাটাই, বুদ্ধির প্রয়োগ করি। আমার অনেক কিছুই মুখস্ত থাকে না। সেজন্য ব্যর্থ চেষ্টা বাদ দিয়েছি। এই যে টেক্সট বইয়ের মূল বিষয়গুলো প্রথমেই পড়ে ও বুঝে এগিয়ে গেছি, শিক্ষা বিষয়ে জীবনের কোথাও আমার বেগ পেতে হয়নি। বরাবরই আমি নিজের ভাষা ব্যবহার করে লিখে চলেছি। লেখার মান শিক্ষকের লেখা নোটের মতো অত উন্নত হয় না, কিন্তু নিজের জানাকে কিছুটা হলেও প্রকাশ করতে পারি। আমার শিক্ষা জীবনে সার্থকতা এসেছে। আমার এ ঘটনাকে লেখাপড়ার একটা কেস স্ট্যাডি বলতে পারেন।

এখন এদেশের শিক্ষার বাস্তব অবস্থা নিয়ে কিছু বলি। প্রথম শ্রেণি থেকেই কমপক্ষে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের হাউস-টিউটর কিংবা কোচিং সেন্টারভিত্তিক লেখাপড়ায় অভ্যস্ত করে তোলা হচ্ছে। হাউজ-টিউটর ও কোচিং সেন্টারের ওপর ছাত্রছাত্রীদের নির্ভশীলতা বাড়ছে। হাতে গোনা কিছু ছেলেমেয়ে নিজের ইচ্ছায় অথবা অভিভাবকের প্রেরণায় টেক্সট বইটা পড়ে শেখার চেষ্টা করে। বাকিরা সবাই পরীক্ষা পাশের জন্য পড়ে, শিক্ষক সহজ বুদ্ধিতে নোট মুখস্ত করায়। টিউশনির নামে শিক্ষার সবটুকু ঘেটে ব্লাইন্ডার মেশিনে শিক্ষকের নিজ চেষ্টায় ব্লেড করে ছাত্রছাত্রীকে গিলিয়ে পেটে পুরে দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা রেডি করা জিনিস শুধু গেলে। পরীক্ষার পরেই আবার ভুলে যায়। শেখার কাজ কিছুই হয় না। মূল বিষয় সম্বন্ধে ভাবনার কোনো অবকাশ নেই। মূল সমস্যাটা এখানেই। লেখাপড়া করতে নির্দিষ্ট অধ্যায়ের টপিক নিয়ে বা শিক্ষার বিষয়টা নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা

নেই; বারবার ভেবে দেখা নেই, মগজ খাটানোর কোনো কাজ ও প্রচেষ্টা নেই, জ্ঞানের অনুসন্ধান নেই, বাস্তবের সাথে বিষয়টির মেলানো নেই। বাস্তব বিষয়ের সাথে বইয়ের পড়া মিলিয়ে একাধিক উদাহরণ দেওয়া নেই। বিষয়টি বুঝে নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। টপিক সম্বন্ধে বোঝার জন্য একবারও বইটা পড়ে দেখা নেই। অনেক ক্ষেত্রে বইটার নাম ও লেখকের নামও জানা নেই। শুধু সিলেকটিভ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর নোট দেখে অথবা কোচিং-সেন্টারের শীট কিংবা গৃহশিক্ষকের মনমতো মুখস্ত করা। ঠিক আমার কুরআন পড়ে সূরা মুখস্তের মতো। এমসিকিউ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল অধ্যায়টা বুঝে পড়ে টপিকের কতটুকু ভেতরে ঢুকতে পেরেছে, কয়েকটা প্রশ্ন করে তার গভীরতা যাচাই করা। সেখানেও ছাত্রছাত্রীরা নোটবই থেকে তৈরি করা অনেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর মুখস্ত করে নিয়েছে। টেক্সট বইটা আদৌ পড়েনি, টপিক নিয়ে মাথা খাটিয়ে একটুও ভাবেনি। টেক্সট বইয়ের টপিকটা তার মেধায় কোনো ভাবনার উদ্রেক করেনি, চিন্তার রাজ্যে নাড়া দেয়নি, অলক্ষ্যে রয়ে গেছে। তাকে শিক্ষা বলবো কীভাবে? এই 'না-সূচক' কথাগুলোকে 'হ্যাঁ-সূচক' করাটাই আমার শিক্ষা পদ্ধতির বাস্তবায়ন। এটা অবশ্য আমার আবিস্কৃত কোনো শিক্ষাপদ্ধতি না; এদেশের শিক্ষার পুরাতন টেকনিক। শিক্ষাঙ্গনে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। টেক্সট বইটা যতবার পড়বে, শিক্ষার সেই অংশটুকুর বিষয়ে তার তুলনায় বেশি সময় নিয়ে শিক্ষার্থী ভাববে, সত্য অনুসন্ধান করবে, তারপর শিক্ষা পূর্ণতা পাবে। অধিকাংশ ডিগ্রীপাশ ছাত্রছাত্রী বাংলা বাক্যগুলো ভালোভাবে লিখতেও পারে না। ভাবতেও পারে না, আবার বিষয়টা নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশও করতে পারে না। এটাই এদেশে শিক্ষার ব্যর্থতা। নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবাতে গেলে পচা কাদা উঠে আসে। গলদটা কোথায়? এখানে। আমরা ভেবে দেখিনে। গলদগুলো মেরামত করিনে। বিদেশ থেকে শিক্ষাপদ্ধতি বাঙালির জন্য আমদানি করা ফরজ বলে গণ্য করি। বছরের পর বছর, তারপর যুগ যুগ পার হয়ে যায়। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে শিক্ষা-উন্নয়ন প্রজেক্ট করি, টাকার শ্রাদ্ধ হয়ে যায়। আমদানিকৃত পদ্ধতি পুরোনো হয়ে পরিবর্তন ঘটে; এদেশের শিক্ষার মান ক্রমেই নিম্নগামী হয়। যে-দেশ থেকে শিক্ষাপদ্ধতি আমদানি করি, তাদের সমাজ-সংস্কৃতি, পরিবেশ-

পারিপার্শ্বিকতা, মানুষের চিন্তা-চেতনা, সামাজিক বুনন, পাঠদানের সমস্যা, সর্টকাট বুদ্ধির আবিস্কার, অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষের মননশীলতা ও প্রেক্ষাপট এবং আমাদের দেশের এসবকিছু কি এক? তাহলে আমরা কেন ঘোড়ার সাথে গাধাকে এক জোয়ালের দু'পাশে জুড়ে লাঙল টানাতে বৃথা চেষ্টা করি? বারবার আত্মপ্রবঞ্চনা করি? আমরা কি বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে বাঙালিদের সমাজোপযোগী 'বাঙালি শিক্ষাপদ্ধতি'র প্রচলন করতে পারিনে? এদেশে কি ভাবুক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদের অভাব আছে?

ছাত্রছাত্রীরা মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের সর্বাধিক অপব্যবহার করছে, এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এই অপব্যবহারের ফলে মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পড়াশুনা ছেড়ে বিপথে যাচ্ছে। অকালপক্ক হয়ে উঠছে। লেখাপড়া শিকেয় উঠছে। সব বয়সের জন্য সবকিছু উপযুক্ত ও ভালো নয়, এ বোধশক্তি আমরা হারাতে বসেছি। অথচ আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে ইন্টারনেটসহ মোবাইল ফোন দিয়ে তা ব্যবহার করে হোমওয়ার্ক তৈরি করার পরামর্শ দিচ্ছে। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা ঐ ইন্টারনেটকে ভালো কাজে ব্যবহার করবে, না অপব্যবহার করবে? নিজেই একটু ভেবে দেখুন। শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকই ফাঁকিবাজ, নীতিহীন। অনেকেই ভাবেন, 'গোলেমালে কেটে যাবে দিন'। জাত শিক্ষকের সংখ্যা কম। শিক্ষকরা বাসায় বসিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট যখন পড়ান, তাদের দিয়ে পড়া মুখস্ত করান। স্কুলে এসে যেভাবে পড়ানো দরকার সেভাবে পড়ান না। স্কুলের পরিবেশও শিক্ষার উপযুক্ত নয়। সেখানেও কলুষিত রাজনীতির ঘনঘটা। নিজেরা একজোট হয়ে পরিবেশ উন্নত করতে পারেন। তা ইচ্ছা করেই করেন না। দায়িত্ববোধের অভাব। গঙ্গামুখো পা দিয়ে বসে থাকেন। অবস্থাটা 'কার গোয়াল, কে দেয় ধুমো!' দিন পার হয়ে যাচ্ছে। তিন ধরণের ফাঁকিবাজ শিক্ষক আছেন। এক শ্রেণির শিক্ষক নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী, কিন্তু খারাপ পরিবেশের সাথে বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার তাগিদে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। এ অবস্থার প্রতিবাদ করছেন না। আগ বাড়িয়ে ভালো কিছু করতে আসেন না; 'পাছে লোকে কিছু বলে'। অন্য আরেক ধরনের শিক্ষক প্রাইভেট কোচিংয়ে অনেক সময় দেন, স্কুলে সময় দিতে

যত আপত্তি। শিক্ষা-বাণিজ্য করে টাকা কামাচ্ছেন। প্রাইভেট কোচিংয়েও নিজে কষ্ট করে নোট বানিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেন। ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবইটা ভালো করে পড়তে ও বুঝতে বাধ্য করেন না। অন্য আরেক ধরণের অগণিত শিক্ষক স্কুলে রাজনৈতিক তদবির ও টাকা দিয়ে ঢুকে পড়েছেন। তাদের কোনো ক্লাসে পড়ানোর যোগ্যতাই নেই। শিক্ষার রাজ্যে লবডঙ্কা। তাই ফাঁকি দেওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। এমনকি শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক তৈরিকৃত শিক্ষক-গাইডটা পড়ে বোঝার মতো যোগ্যতাও তাদের নেই। এরা ঐ টিক চিহ্ন দিয়ে মুখস্ত করে নামমাত্র পাশ করে এসেছেন, শিক্ষকতা পেশায় এসে সেটাই প্রয়োগ করছেন। এ সংখ্যা শিক্ষাঙ্গনে ক্রমেই বাড়ছে; শিক্ষামানও তত অধঃপাতে যাচ্ছে। এটাও একটা দুষ্টচক্র বা ভিশাস সার্কেল। শিক্ষার মান নিম্ন হওয়ার এটাও একটা বড় কারণ। শিক্ষকরা যে শুধু শিক্ষকতা ছাড়াও প্রতিটা ছাত্রছাত্রীর মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, এদেশে তা উঠে গেছে। যে-সব অভিভাবকরা সচেতন, তারা উপায়ান্তর না দেখে, স্কুলের ওপর ভরসা না করে বাসায় উপযুক্ত টিউটর রেখে, ছেলেমেয়েকে বুঝিয়ে মোটিভেট করে টেক্সট বই পড়িয়ে ভালোমতো শিক্ষা দিতে পারছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুযোগ করে নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। কোনো কোনো গরিবের ছেলে নিজেই অনুপ্রাণিত হয়ে টেক্সট বইটা বারবার ভালো করে পড়ে ও শিখে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এগুলোই বড় করে দেখিয়ে 'মহান রাজনীতিকরা' ও 'শিক্ষা বিভাগ' ফলাও করে কৃতিত্ব জাহির করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছেন। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী পরিবেশ ও অভ্যাসের কারণে অবহেলিত রয়ে যাচ্ছে। জীবনে তাদের মেধার বিকাশ হচ্ছে না। এদেশের শিক্ষা বিভাগ গা-ছাড়াভাবে দিন পার করছে। এসবই আমি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে স্বচোক্ষে দেখে অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিলেও তা হচ্ছে নামকা-ওয়াস্তে। টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে না। বাস্তবায়ন নেই। অনেক শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেওয়ার মতোও যোগ্যতা নেই। প্রত্যেক শিক্ষককে নিজ উদ্যোগে শিশু সাইকোলজি বইটা ভালো করে বাধ্যতামূলকভাবে বাড়িতে পড়তে হবে।

কেউ প্রাইভেট টিউশনি করলে কিংবা কোচিং ব্যবসা করলেই যে সেটা খারাপ তাও নয়। মূলত পাঠ্যপুস্তকটা ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে না। সেখানে কি লেখা আছে জানছেও

না। সহজ বুদ্ধিতে পাশ করে যাচ্ছে। শিক্ষকরা আরো সহজ বুদ্ধি জোগাতে সহযোগিতা করছেন; শিক্ষাদান বিষয়টা ঠিক আগে-বলা আমার সেই বোধহীন আত্মীয়কে ব্লেন্ডিং করে পাইপ দিয়ে খাবার পাকস্থলিতে পৌঁছে দেবার মতো হচ্ছে। এটা থেকে বেরিয়ে না আসার আগ পর্যন্ত এদেশের শিক্ষার কোনো উন্নতি নেই। এসব রোগগুলো শিক্ষকদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের সহজ বুদ্ধি দিয়ে তাদের অভ্যাসও খারাপ করে ফেলেছি। ছাত্রছাত্রীদের ঐ বয়সে আমরাও সহজ বুদ্ধি খুঁজতাম। অল্প পড়ে সহজে পাশ করতে, বেশি বেশি নম্বর পেতে চাইতাম। ভাবনা ও কাজগুলো ছিল আমাদের জন্য আত্মঘাতি, তখন তা বুঝতাম না, এখন বুঝি। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। প্রত্যেক শিক্ষককে প্রায় প্রতিটা ক্লাসে পাঁচ-দশ মিনিট ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে মোটিভেশনাল বক্তৃতা দিতে বাধ্য করতে হবে। দেখবেন, কমপক্ষে আশি শতাংশ ছাত্রছাত্রী জীবন গড়তে উদ্বুদ্ধ হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত অভিভাবকমহলকে নিয়মিত ভালো দায়িত্ববোধ শেখার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। লেখাপড়া বিষয়ে কোনো অভিভাবকের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত হবে না। অভিভাবকদের মধ্যেও ধারণা জন্মেছে, টিউটরের কাছে পড়লেই ছেলেমেয়ে ভালো করবে। এটা ভুল। স্কুলে লেখাপড়া হয় না বলেই দিনে দিনে এ ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির মধ্যেও গলদ আছে। প্রশ্নের ধরনে ছাত্রছাত্রী মেধা খাটিয়ে নিজের ভাষায় (ইংরেজি এবং বাংলাতে) লিখতে বাধ্য হবে, এমন কিছু নেই। নোট মুখস্ত করে লিখলে শিক্ষকরা বেশি নম্বর দেন। কারণ নোট তৈরি করেছেন একজন উচ্চ-লেখাপড়া জানা শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীদের অপরিপক্ক লেখায় অনেক শিক্ষক বেশি বেশি ভুল ধরেন, নম্বর কমিয়ে দেন। অথচ ক্লাশে যদি আগেই বলে দেওয়া যায় যে, টেক্সট বইটা ভালোমতো পড়ে নিজের ভাষায় লিখলে বেশি নম্বর দেওয়া হবে; তাহলে ছাত্রছাত্রীরা টেক্সট বই পড়বে ও নিজের ভাষায় লিখবে। ক্লাশে বসিয়ে নিজের ভাষায় লেখার প্রাকটিসও ছাত্রছাত্রীদের করানো যায়। শিক্ষকরা লেখা পরীক্ষা করে নম্বর দিতে পারেন। এটাকে ক্লাস-ইভ্যালুয়েশন হিসেবে গণ্য করা যায়। এতে ছাত্রছাত্রীরা যারপরনাই উপকৃত হয়। যে কোনোভাবেই হোক ছাত্রছাত্রীকে টেক্সট বইটা ভালোভাবে বুঝে পড়তে বাধ্য করতে হবে। বইয়ের

যেখানে তারা বুঝতে পারবে না, শিক্ষকরা বুঝিয়ে দেবেন; এ জন্যই শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীরাই মেধা খাটিয়ে বুঝে টেক্সট বইটা কয়েকবার পড়বে। পরীক্ষার প্রশ্ন প্রতিটা অধ্যায়ে প্রথমটা হবে– বিষয়টা বলতে শিক্ষার্থী কী বোঝে তা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লিখবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হবে একটু কনসেপচ্যুয়াল। তৃতীয় প্রশ্নটা হবে আরেকটু বেশি কনসেপচ্যুয়াল। প্রতিটার জন্য আলাদা মান বণ্টন থাকবে। প্রতিটা অধ্যায়ের প্রথমে উল্লিখিত উদ্দেশ্যই বলে দেবে প্রশ্ন কেমন হবে।

নতুন যে পদ্ধতি এদেশে চালু করা হয়েছে, ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম পুরোপুরি চালু করলেই বুঝতে পারবে, এখানে বিশাল গলদ আছে। ক্লাসের চলমান মূল্যায়নে সব ছাত্রছাত্রী পঁচিশের মধ্যে পঁচিশ বা পঞ্চাশের মধ্যে পঞ্চাশ পাবে। অর্ধবার্ষিকী এবং বার্ষিক লিখিত পরীক্ষায় এক থেকে দশের মধ্যে নম্বর পাবে। অথচ কিছু শিখবে না। তখন প্রত্যেক শিক্ষককে দয়া করে নম্বর দিয়ে শিক্ষার্থীকে পাশ করাতে হবে। এটা আমাদের বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অথবা চাকরি বাঁচানোর খাতিরে করবে, কিংবা স্থানীয় কোনো নেতার ধমক থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য করবে। বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি করতে হলে এদেশের শিক্ষার সমস্যাগুলোকে মাথায় রেখে সময়োপযোগী পাঠদান পদ্ধতি ও স্বভাব-উপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে পাঠ্যবইটা বারবার পড়তে, বুঝতে, তা নিয়ে ভাবতে ও ক্লাসে বসে শিখতে এবং নিজ ভাষায় লিখতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। অঙ্ক যাতে শিক্ষার্থীর এ্যানালাইটিক্যাল এ্যাবিলিটি বৃদ্ধি করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষায় মেধা বিকাশের চর্চা বাড়াতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি ও অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি বাড়াতে হবে। সবকিছুই অভিভাবকদের সাথে নিয়ে শিক্ষক করবেন।

আগেই বলেছি, শিক্ষক শুধু ক্লাসে একমুখী বক্তৃতা দিয়ে বাড়ির কাজ দিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে আসবেন, তা হবে না। প্রতিদিন ৬টা বা ৮টা বিষয়ের ক্লাস স্কুলে করতে হয়, এ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। স্কুলে প্রতিদিন তিনটা বা চারটা বিষয়ের ক্লাস নিতে হবে। ক্লাস থ্রী থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা বা সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ক্লাস চলবে। প্রতিটা ক্লাসের সময় বাড়িয়ে দিতে

হবে। সময় হতে হবে কমপক্ষে দেড়ঘন্টা থেকে বিষয়ভেদে দুই ঘণ্টা। একজন ছাত্র/ছাত্রী চল্লিশ মিনিটের বেশি একমুখী শিক্ষকের বক্তৃতায় মনোযোগ ধরে রাখতে পারবে না। শিক্ষককে ক্লাশ বানাতে হবে আনন্দদায়ক। স্কুলে বসে তাকে লেখাপড়া করতে হবে, মাথা খাটিয়ে শিখতে হবে। শেখানোর পর শেখা বিষয়টা নিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ভাবতে বলতে হবে। ক্লাসের প্রথমেই শিক্ষক চল্লিশ মিনিট কোনো অধ্যায়ের বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেবেন। ক্লাশে কোনো স্লাইড দেখানো যাবে না। পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়াতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক পড়ার অভ্যাস করাতে হবে। ক্লাস অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। তারপর শিক্ষক প্রতিটা ছাত্রছাত্রীকে বই খুলে বিষয়টা ভালোমতো পড়তে বলবেন। কখনো ৪জনের গ্রুপ করে গ্রুপ-আলোচনা করতে বলবেন। পড়া বা আলোচনা শেষে তাদের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য থাকলে শিক্ষক তার উত্তর বুঝিয়ে বলবেন। অতপর ছাত্রছাত্রীকে বিষয়ের ওপর দুইটা কিংবা তিনটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেবেন। শিক্ষকের সামনে নিজের ভাষায় লিখে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হবে। শিক্ষক কখনো ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন। যাদের প্রশ্ন করবেন, তারা ক্লাসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সবার সামনে উত্তর মুখে বলবে। অন্যরা শুনে শিখবে। শিক্ষক চলমান মূল্যায়ন অব্যাহত রাখবেন। অঙ্কের ক্লাস হলে চল্লিশ মিনিট শিক্ষক অঙ্ক শেখানোর পর ক্লাসে বসিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক প্রাকটিস করিয়ে নিতে পারেন। পরে বোর্ডে কোনো অঙ্ক লিখে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে সমাধান করতে বলতে পারেন। এভাবেও মূল্যায়ন হবে। অঙ্ক যা শেখাবেন, তার বাস্তব প্রায়োগ শেখাতে হবে। প্রতিটা ক্লাসের মাঝখানে দশ মিনিটের বিরতি থাকবে। শিক্ষকদের অফিস সময় হবে নয়টা থেকে পাঁচটা। অবসর সময়ে শিক্ষক ক্লাস-পরীক্ষাগুলোর খাতা মূল্যায়ন করে ক্লাসে দেখাবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। প্রথমে পদ্ধতিটা বিদঘুটে মনে হলেও বিষয়গুলো অভ্যাসের ব্যাপার। এক বছর চলার পর সবকিছু অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। শিক্ষককে পর পর একাধিক ক্লাস দেওয়া যাবে না। স্কুলে একটা টিভি রুম থাকবে। সেখানে কোনো একটা সময়ে শ্রেণিভিত্তিতে বিভিন্ন জীবনমুখী ও মানবিক শিক্ষামুখী ডক্যুমেন্টারি ফিল্ম ৪৫ মিনিট দেখানো হবে। ফিল্মগুলো আনন্দদায়ক হতে হবে। মাঝেমধ্যে ঐ ফিল্ম থেকে কি শিখেছে, তা ক্লাসে প্রশ্ন করে মূল্যায়ন

করতে হবে। প্রতিটা স্কুলে খেলার মাঠ থাকবে। ক্লাসের ফাঁকে একবার খেলার সুযোগ দিতে হবে। ভালো মানের একটা ক্যান্টিন অবশ্যই থাকবে। টিফিন সময়ে এবং দুপুরে তারা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার যাতে খেতে পারে, তার ব্যবস্থা থাকবে। স্কুলে কো-কারিকুলার এ্যাকটিভিটি বেশি থাকবে। প্রতিটা পর্যায়ে ক্লাসের বই এবং বয়সের উপযোগী বাইরের বই পড়ার প্রতিযোগিতা নিয়মিত চলবে। প্রতিটা বিষয় শেখাতে শিক্ষক জীবনের বাস্তবতা থেকে উদাহরণ দেবেন। ছাত্রছাত্রীকেও বাস্তবতা থেকে উদাহরণ দিতে বলবেন। সাপ্তাহিক ছুটির আগে বাড়িতে কিছু পড়ার কাজ ও হাতের কাজ দিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা নোটবইয়ের সাহায্য নিতে পারে এমন কোনো বাড়ির কাজ দেওয়া যাবে না। পাঠ্যবই পড়া ও লেখার কাজ দেওয়া যায়। জীবনমুখী ও মানবিক-গুণাবলী সঞ্চারক কোনো কোনো শিক্ষা বিষয়ে বাড়ির কাজ দেওয়া যায়। চলমান ক্লাস মূল্যায়নের নম্বর কোনোক্রমেই ত্রিশ-এর বেশি হবে না। বাকিটা তাকে অর্ধ-বার্ষিকী ও বার্ষিক পরীক্ষায় পরীক্ষার মাধ্যমে লিখে অর্জন করতে হবে। পরীক্ষার রুমে বই দেখে নিজের ভাষায় লেখার তথাকথিত মূল্যায়ন পদ্ধতি বাদ দিতে হবে। এতে বাঙালির ঘোড়ারোগ দেখা দেবে। মূল্যায়ন ত্রিভূজ-চতুর্ভূজ বাদ দিয়ে নম্বরে যেতে হবে এবং বছর শেষে নম্বরের যোগফল অনুযায়ী এবিসিডি গ্রেডে রূপান্তর করতে হবে। ক্লাসে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের জীবনের উন্নতি হয় এমন উদ্দীপনামূলক কথা বেশি বেশি বলবেন। কল্পনায় ভবিষ্যত জীবনের উন্নতি দেখিয়ে ছাড়বেন। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে রাজনীতির বিষাক্ত বীজ বপন করার চেষ্টা না করাই ভালো।

আমি জানি, শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা নেই বলেই অনেকে প্রাইভেট টিউশনির দিকে ঝুঁকে পড়েন। শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টিও বিবেচনা করা দরকার। এক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষকদের জন্য সরকার আলাদা উচ্চ-বেতন স্কেল ঘোষণা করতে পারে। তবে সরকারি সব কর্মকতা-কর্মচারির বেতন বাড়বে, সে-সাথে শিক্ষকদের বেতন বাড়বে, এতে কোনো লাভ নেই। বেতন দশ টাকা বাড়লে দ্রব্যমূল্য বাড়বে বিশ টাকা বা টাকার মূল্যমান কমবে পনেরো টাকা। এরকম বেতন না বাড়াই ভালো। বরং নিট সুবিধা কিভাবে বাড়ানো যায় সে চিন্তা করাই শ্রেয়। নিট সুবিধা বাড়ানোরও অনেক পথ আছে। প্রয়োজন সদিচ্ছার। এ পর্যায়ে

আমি সে-সব আলোচনা করতে গেলে 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া' হবে। বরং আমি অন্য একটা বিকল্পের প্রস্তাব দিতে পারি। শিক্ষকরা বাড়িতে প্রাইভেট টিউশনি আইন করে পুরোপুরি বন্ধ করে দেবেন। স্কুলের সময় সকাল ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত দেবেন। স্কুলের প্রতিটা ক্লাসের ডিউরেশন বাড়িয়ে দেবেন। স্কুলের পড়া স্কুলেই শেষ করবেন। (বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্কুলের সময় আমাদের দেশের স্কুল-সময়ের তুলনায় বেশি)। এটাকে ফুল-টাইম স্কুলিংও বলা যেতে পারে। শিক্ষক এবং স্কুল কমিটি মিলে এই সিদ্ধান্তে আসবেন যে, অভিভাবকমহল যে টাকাটা প্রাইভেট টিউটরকে দিতেন, সেই টাকার একটা যুক্তিসংগত অংশ স্কুল প্রশাসনকে দেবেন। ক্লাস ডিউরেশন বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে প্রাইভেট টিউটরের কাজটা ক্লাসে বসেই হবে। শিক্ষকদের সবাই তাদের নিয়মিত মাসিক বেতন ছাড়াও এ টাকাটা নিজেরা প্রতি মাসে বণ্টন করে নেবেন। কথায় আছে, 'ঘরে বাইরে এক মন, তবেই করো কৃষ্ণ ভজন'। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দুরাচারবৃত্তি, পারস্পরিক হিংসা, স্বার্থান্ধতা, দলবাজি ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' মনোভাবের যবনিকাপাত ঘটেছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসা যায় কিনা শিক্ষকরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন এবং এভাবে প্রত্যেকের পরিবারের সচ্ছলতা একটু হলেও বাড়াতে পারেন। তবে কোনোক্রমেই প্রাইভেট টিউশনি ও নোট মুখস্তকে সমর্থন করা যায় না।

ভাষাজ্ঞান নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ভাষাজ্ঞান না থাকলে বোঝার বিষয়টা লিখে প্রকাশ করবে কীভাবে? আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি কিংবা বাংলা ভাষা দুটোতেই খুব দুর্বল। ইংরেজি অক্ষর দিয়ে বাংলা শব্দ লিখতে খুব অভ্যস্ত। সব সময় ইংরেজি গ্রামার ও রচনা মুখস্ত করানো হয়। সাধারণ কিছু গ্রামার শেখাতে হবে। রচনা মুখস্ত বাদ দিতে হবে। প্রথম থেকেই ইংরেজি বাক্য গঠন করা শেখাতে হবে। নিজের তৈরি ছোট ছোট বাক্য দিয়ে প্যারাগ্রাফ লেখা শেখাতে হবে। বর্ণনা লেখা শেখাতে হবে। 'বাড়ি থেকে মুখস্ত করে এসো'– বলা যাবে না। স্কুলে বসিয়ে শেখাতে হবে। জোড়া মিলিয়ে দিয়ে ইংরেজিতে কথা বলাতে হবে। হাতে-কলমে ও বলায় প্রাকটিস করাতে হবে। শব্দভাণ্ডার গড়ে

তুলতে হবে। ইংরেজির প্রতিটা না-জানা শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে কমপক্ষে ১৫টা নতুন বাক্য ক্লাসে বসিয়ে লেখাতে হবে এবং জোরে জোরে পড়ে মুখের জড়তা কাটাতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা পড়া শেখাতে হবে। আগেই বলেছি পড়া মানে শুধু উচ্চারণ করে পড়ে যাওয়া নয়। বিষয়টার মর্মার্থ বোঝা ও বিষয়টা নিয়ে জ্ঞানার্জন করা। দেখা যায় ও দেখা যায় না এমন কিছু বিষয়ে ক্লাসভেদে নিজের ভাষায় বাংলা লেখা বারবার প্রাকটিস করাতে হবে। প্রথমে দৃশ্যমান বিষয়ের ওপর লিখবে, পরে অদৃশ্য কোনো বিষয় বা দোষ-গুণের ওপর লিখবে। নিজের বাংলাভাষা দিয়ে নীচের ক্লাস থেকে বেশি বেশি লেখাতে হবে। ভাষাজ্ঞান ভালোমতো অর্জন করতে পারলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য লেখাপড়া করা বা পড়ে জ্ঞানার্জন করা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। ইংরেজির ক্ষেত্রেও তা-ই। এতে পড়ালেখার ভয়টাও দূরীভূত হয়। এজন্য তৃতীয় শ্রেণি থেকেই ভাষাজ্ঞানের ওপর ক্রমেই চাপ দিতে হবে। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির মুখস্ত-করা ব্যবসা অথবা ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের নোট মুখস্ত করানোর জীবনঘাতী ফাঁকিবাজি শিক্ষা যে কোনো মূল্যে বন্ধ করাতে হবে। এটা নিশ্চিতভাবেই দেশ ও জাতি-বিধ্বংসী ব্যবস্থা। এগুলো যতদিন চলবে, এমনকি মঙ্গলগ্রহ থেকে শিক্ষাপদ্ধতি আনলেও বস্তুত কোনো লাভ হবে না। পাঠ্যক্রম বিষয়টা একটা বড় আলোচনা বলে আলাদাভাবে করাই ভালো।

ছয়: শিক্ষার অভিমুখিতা

এর আগের অধ্যায়ে শিক্ষার ভিত্তিমূল ও উপকরণ বিষয়ে লিখেছি। শিক্ষা, পরিবেশ, সমাজের বর্তমান অবস্থান, আমাদের অবস্থা, শিক্ষার গুরুত্ব, দেশের উন্নয়নে মানবসম্পদের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়েও লিখেছি। একটাই কারণ এদেশের মানুষ শিক্ষামুখী নয়, বরং রাজনীতিমুখী। সামাজিক শিক্ষার অবস্থাও অন্তঃসারশূন্য ও ধসে পড়েছে। বর্তমানে যুব সমাজের বৃহদংশ শিক্ষাবিমুখ এবং সময় কাটানোর জন্য ফেসবুকমুখী ও বিনোদনমুখী। এই বিনোদনমুখিতাও আবার অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম। এই কারণে বলছি যে, একজন হাতে সময় পেলে, বিকালে খেলার মাঠে গিয়ে খেলবে কিংবা বয়স ভেদে হাঁটাহাঁটি করবে, যা তার শরীরের জন্য উপকার হবে। বাস্তবে তা দেখি না। মোবাইল ফোন কিংবা ল্যাপটপে বসে খেলার ছলে আত্মহারা হয়ে কার্সার দিয়ে বল মারে; কিংবা অন্য কোনো ভার্চুয়াল গেমের আকর্ষণে মত্ত হয়ে পড়ে, হালকা বিনোদন-কর্মে যোগ দেয়। কার্সার দিয়ে বল মেরে কি শারীরিক ব্যয়াম হয়? এসব কর্ম জীবনের এমন কী উপকারে লাগবে, বুঝি না। ইন্টারনেট-প্রযুক্তি জ্ঞানার্জন ও জীবনগড়ার উপাদানের যত অনায়াসসাধ্য অধিগম্যতা দিয়েছে, তেমনি জীবন ধ্বংসকারী উপাদানের সহজলভ্যতাও দিয়েছে। কিশোর ও যুবসমাজের অধিকাংশেরই জীবনধ্বংসকারী উপাদানের দিকে ঝোঁক বেশি। জীবন ধ্বংসকারী উপাদান থেকে নিবৃত্ত করার জন্য না আছে কোনো নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, না আছে জীবনগড়ার উপাদানমুখী অনুপ্রেরণামূলক বা প্রণোদনামূলক কোনো ব্যবস্থা। এমনিতে জনসমাজে নীতি-নৈতিকতা বিলীয়মান। ফলে 'দুনিয়া আনন্দময়, যার মনে যা নেয়' মনোভাবে যুবসমাজ চলছে। কিশোর ও যুবসমাজ জীবনধ্বংসকারী উপাদানের ব্যবহার করে জীবন অন্ধকারময় করে তুলছে। এছাড়াও এদেশের মানুষ খুব হুজুগে, রাজনীতিপ্রিয় ও কানপাতলা। মানুষ রাজনীতির পরিবর্তন এবং অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও বিষয় নিয়ে যতটা না অবহিত, শঙ্কিত ও বিজড়িত থাকে, বলা যায় তার দশ শতাংশও শিক্ষার্জন ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়, নয় নিজের জীবনগড়ার কাজে নিয়োজিত। অবশ্য রাজনীতির পরিবেশের ওপর শিক্ষামানের উন্নতি-অবনতি বহুলাংশে নির্ভরশীল, একথা সত্য। তাই কেউ যদি কাউকে প্রশ্ন

করে, 'আপনাদের দেশে শিক্ষার দশা কেমন? এক কথায় এর উত্তর আসবে 'রাজনীতির দশা যেমন, তেমন'। দেশে শিক্ষামানের যদি অধঃপতন ও মানহীনতা হয়ে থাকে তার জন্য এদেশের রাজনৈতিক পরিবেশের অধঃপতন ও দেশ পরিচালকদের দলবাজি, চর দখলের মতো ক্ষমতা দখল, দায়িত্বে অমনোযোগিতা, গ্রুপ-স্বার্থপরতা ও অদূরদর্শিতাকে সরাসরি দায়ী করা যায়। একমাত্র অভিভাবকরাই সন্তানসন্ততির শিক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন ও দিশেহারা। পরিবেশ ও সিস্টেমের কারণে যাদের ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে এবং এখনোও নষ্ট হতে চলেছে– তাদের অনুশোচনা ও ছটফটানি অন্য কেউ বুঝতে সমর্থ হবে না বা বুঝতে চাইবেও না। অসচেতন অভিভাবকরা ভাগ্যের ওপর দোষ চাপিয়ে বংশ পরম্পরায় অশিক্ষার যাতাকলে পড়ে জীবন পাড়ি দিচ্ছে। সচেতন অভিভাবকরা আবার জোটবদ্ধও নয়। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলবাজি, স্বজনপ্রীতি, লেনদেনের প্রাধান্য ও দলীয় প্রাবল্য বেশি। এরা প্রয়োজনে হাউজ-টিউটর রেখে, সন্তানকে কোচিংয়ে পাঠিয়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে, যা শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার কোনো পরিপূরক নয়। এছাড়াও এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তথাকথিত ভিত্তিহীন প্রগতিশীলদের সম্প্রসারণবাদী প্রভুভক্তি, ভোগবাদী মানসিকতা ও বস্তুবাদ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা প্রণিধানযোগ্য। এরা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া শিখিয়ে নীতিনৈতিকতাহীন বস্তুবাদী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করতে চায়। এটা এদের অলিখিত প্রতিজ্ঞা। এদেশে এই বিপরীতমুখী দুপক্ষের মধ্যে টানাপোড়েন স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত অবিরাম চলছে। বস্তুবাদীদের পাল্লা ভারী। করণ এদের বিরোধী পক্ষের অনেকেই অশালীন গালি (যেমন– মৌলবাদী) খাওয়ার ভয়ে নিজেরা তর্কে জড়াতে চায় না। মৌলভি-মাওলানারা কখনো 'ইসলাম গেলো, ইসলাম গেলো' বলে রাজপথে শ্লোগান হাঁকে বটে, তাদের আধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, শিল্পোন্নয়নের জ্ঞান, দেশগঠন, জীবন দর্শন ও ইসলামের মূল দর্শনের চিন্তা-ভাবনা খুবই কম। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে জনগোষ্ঠীর ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও উন্নয়নের ধারণা তাদের মাথায় নেই। শিক্ষার উন্নয়ন তারা বোঝে না। গাইডলাইন ও উদ্দেশ্য না বুঝে কুরআন পড়া ও হাফেজ বানানোর আনন্দে তারা আত্মহারা। তাদেরকে ঠাণ্ডা রাখার কৌশল অতি সাধারণ। এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে তথাকথিত

প্রগতিবাদীরা বা বস্তুবাদীরা। বিদেশী সম্প্রসারণবাদী শক্তি তথাকথিত প্রগতিবাদী বা বস্তুবাদীদের পক্ষের শক্তি ও দোসর হিসেবে কাজ করে, এটাও এদেশে সুশিক্ষার উন্নয়নে একটা বড় প্রতিবন্ধকতা। এজন্য আমাদের সমাজে সুশিক্ষার এ দীনতা বলা যায়। আমরা অর্থাৎ মাস্টারসাহেবদের অনেকেই তা সচোক্ষে দেখছি বলেই বলছি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করার কিছু থাকে না। কেউবা জেগে ঘুমায়। ভুগছে মূলত শিক্ষাব্যবস্থা, দেশ ও সাধারণ মানুষ। কোটি কোটি আদম সন্তান, যাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে তারাই হতো এদেশের মানবসম্পদ, দেশপ্রেমী শক্তি ও স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা। সত্য যে, শিক্ষার উন্নয়ন মানেই সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়ন। একথা কারো অস্বীকার করার জো নেই। একথা বক্তৃতা-বিবৃতিতে পরিচালকরা বার বার বললেও মন থেকে কাজে এগিয়ে আসে না। তাদের মূল উদ্দেশ্য ভিন্ন। এই একটা মাত্র সীমাবদ্ধতার করণেই এ জাতির উন্নয়নে নিম্নগতি।

যাহোক, এর আগে শিক্ষার ভিত্তিমূল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 'শিক্ষায় সাত-আর' (Seven Rs in Education)-এর কথা বলেছি। এছাড়াও শিক্ষার উপকরণ নিয়ে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করেছি, যেগুলো হলো: শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, পরিবেশ, শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষাপদ্ধতি। শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী, একটু বেশি আলোচনার দাবি রাখে। এজন্য আলাদা অধ্যায় করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষা বা শিক্ষার অভিমুখিতা নিয়ে অল্প পরিসরে কিছু বলবো, এটাও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। তার আগে আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা গল্প বলি।

একদিন আমার বাসায় ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছে, আমি খুবই ক্লান্ত। এসে জামা-কাপড় বদল না করেই বিছানায় শুয়ে পড়েছি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। সকালে দেখলাম, আমার বিছানায় মশারি টাঙানো। মশারি খুলতে গিয়ে দেখলাম, গিরাগুলো এলোমেলো দেওয়া, একটার গিরাও ঠিকমত হয়নি। এমনিতেই হুকের সাথে পেচানো। ছোট মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে রাতে আমার মশারিটা টাঙিয়েছিল। সে বললো, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দেখে সে নিজে মশারিটা টাঙিয়ে রেখে গিয়েছিল। তাকে বললাম, তুমি তো মা এসএসসি

পাশ করতে চলেছো, অথচ এখনো গিরা দিতে শেখোনি; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটা পর্যায়ে গিরা দেওয়া জানতে হয়। আমি গ্রামের ছেলে হওয়াতে বাড়িতেই বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে গিরা দেওয়া শিখতে হয়েছিল। এছাড়া স্কুলজীবনে স্কাউটের সাথে জড়িত থাকাতে কমপক্ষে বারো ধরনের গিরা শিখতে হয়েছিল। সেগুলো বাস্তব কাজে ব্যবহার করেই জীবন পাড়ি দিচ্ছি। অতি প্রয়োজনীয় একটা বিষয়।

নদীমাতৃক এ দেশে সাঁতার জানাটাও অতি জরুরি, যা আমরা গ্রামে থাকতে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে মনের অজান্তেই ছোটবেলায় কবে যেন শিখে ফেলেছি। একবার এক বন্যার সময় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে বিলের মধ্যে নৌকা ডুবে গিয়েছিল। সাঁতার না জানলে আমার ভবলীলা ঐ দিনই সাঙ্গ হতো। আমি সাধারণ জীবন পরিচালনা করতে অনেক শিক্ষাই স্কাউট থেকে শিখেছি। যত বিপদই আসুক, মনোবল না হারিয়ে সহজলভ্য ও প্রাপ্তিসাধ্য উপকরণ নিয়ে সামনের দিকে ধেয়ে চলি– এটাও স্কাউটের শিক্ষা। কাউন্সিলিং ও মোটিভেট করে জীবনপথ থেকে পিছলে-পড়া ছাত্রছাত্রীদের উন্নত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব– এটাও স্কাউট থেকে শিখেছি এবং শিক্ষকতা জীবনে দীর্ঘবছর কাজে লাগিয়ে চলেছি।

শিক্ষার একমাত্র অভিমুখিতা মানুষের জীবন পরিচালনা। তাইতো শিক্ষার মূল অংশটা জীবনের প্রারম্ভেই কর্ম শুরু করার আগে শিখে নিতে হয়। প্রতিটা শিক্ষাই জীবনমুখী, জীবনের জন্য শিক্ষা; মানুষের পুরো জীবন সামাজিকভাবে প্রকৃত মানুষের মতো অতিবাহিত করার জন্যই শিক্ষা। সব শিক্ষাই জীবনের জন্য হলেও কর্মমুখী শিক্ষা একটা পেশাদারী শিক্ষা বা বিশেষ শিক্ষা, যা আলাদাভাবে শেখার প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্লেষণে প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষার অভিমুখিতা হবে তিনটি, এগুলোকে উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাও বলা যায়: ১. জীবনমুখী শিক্ষা; ২. মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা; এবং ৩. কর্মমুখী শিক্ষা।

জীবনমুখী শিক্ষা: সকল শিক্ষাই মূলত জীবনমুখী শিক্ষা বা জীবনের জন্য শিক্ষা। তবুও কর্ম ও পেশা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের সাবলীল ও সাধারণ জীবন নির্বাহ বা অতিবাহিত করার জন্য সাধারণভাবে বাস্তবকেন্দ্রিক কিছু শিক্ষা প্রতিনিয়ত

কাজে লাগে, তা সে যে পেশাতেই থাকুক না কেন। এখানে জীবনমুখী শিক্ষা বলতে সেগুলোকেই বুঝাতে চাচ্ছি; এগুলোকে 'লাইফ স্কিলস' বা স্বনির্ভরতা শিক্ষাও বলতে পারি। জীবনের প্রারম্ভেই স্কুল এবং বাড়িতে এগুলো ব্যবহারিকভাবে শেখা ও চর্চা করা প্রয়োজন। স্কুল-কলেজেও এগুলো শেখানো সম্ভব। যেমন– যেখানে-সেখানে থুথু না ফেলা, টয়লেট ব্যবহার শেখা, মানুষের সাথে কথা বলা (আদবকেতা) শেখা, জীবনে বড় হবার স্বপ্ন দেখতে শেখা, মানুষের সাথে অমায়িক ব্যবহার। ভালো কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সাধারণ রান্না, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রাস্তা পার হতে শেখা, যানবাহনে আরোহণে সতর্কতা, শরীর চর্চা, সাঁতার শেখা, বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি, ট্রাফিক রুলস, দুর্যোগকালীন করণীয়, ভালো সুনাগরিক হতে শেখা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা (ঘরবাড়ি ও প্রাঙ্গণ), বিভিন্ন রকম গিরা (Knot) শেখা, মিথ্যা কথা না বলতে শেখা, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে শেখা, নেশার ক্ষতিকর দিক ও পরিণতি, সেলাই করা ও বোতাম-হুক লাগানো শেখা, কাপড় ধোয়া, ই-মেইল ম্যানার্স, টেলিফোন ম্যানার্স, টেবিল ম্যানার্স, সামাজিক দায়িত্ববোধ শেখা, মানবাধিকার শেখা, বাংলাদেশের সংবিধান সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা, নিজের ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ শেখা, সুস্থ সমাজ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে শেখা, উন্নত জীবন গঠন ও উন্নত চিন্তাভাবনা করতে শেখা, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও প্রতিবেশীর অধিকার, মনে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শেখার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা, জীবনে বড় কোনো পেশায় গিয়ে মানুষকে সেবা করার ইচ্ছা, সময়জ্ঞান ও সময় ব্যবস্থাপনা, আত্মসচেতনতা শেখা, হাতের কাজ (পুরোনো জিনিস থেকে নতুন জিনিস তৈরি), সর্বজনীন পরমত সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বজায় শেখা, ধর্ম-অহিংস মনোভাব শেখা, সম্প্রদায়-অহিংস মনোভাব শেখা, প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা/স্বাস্থ্য সচেতনতা, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার রোধ, প্রতিদিনের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস, ক্লাসের বইয়ের বাইরেও বই পড়া শেখা, দেশীয় সংস্কৃতি ও দেশীয় মূল্যবোধকে সম্মান করতে শেখা, কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার শেখা, অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি ও থিংকিং, প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি ইত্যাদি।

সব শ্রেণির মানুষকেই ফুটপাথ ব্যবহার করে পথ চলতে হয়। কোনো কোনো

ব্যক্তিকে দেখেছি, অনেক ভারী বোঝা বহন করে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছে। মাঝে-মধ্যেই দেখি দু-চারজন স্কুল-কলেজপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ মানুষ ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের গল্পে বিভোর। অন্যের যে পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছে, এ বিষয়ে তারা উদাসীন। তারা পাশে কোথাও নিরাপদে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে, যেখানে অন্যের কোনো অসুবিধা হয় না । এক কথায় বলা যায়, তারা আত্মসচেতন নয়। আত্ম-সচেতনতা শিক্ষা হয়তো তারা কোথাও শেখেনি। ক্লাসে আত্মসচেতনতা শেখানো যায়। আত্মোপলব্ধিও শেখানো যায়। দুটো বিষয়ই সামাজিক জীবনযাপনের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। আমাদের সব নেতারা এসেই দেশ গড়তে চায়। তারা দেশ গড়ার কথাটা মুখস্ত করে চালিয়ে দিচ্ছেন। দেশ গড়তে গেলে যে আগে মানুষ গড়া দরকার, নিজে সুশিক্ষিত হওয়া দরকার, ভাবনাটা হয়তো ঐ 'মহান নেতার' মাথায়ই আসে না। ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়া আমাদের স্বভাব অথবা অজ্ঞতা, কোথাও কোথাও মূর্খতা। পরিবেশ ভেদে কোনো কোনো শিক্ষক এমনই আরো অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আমার দেওয়া এ জীবনমুখী শিক্ষার তালিকায় যোগ করতে পারেন। এভাবে জীবনমুখী শিক্ষার তালিকা ক্রমেই পূর্ণাঙ্গতা পাবে। সব শ্রেণির জন্য সবকিছু শেখা উপযোগী নয়। এগুলো কোনো একটা ক্লাসে একবার শেখালে চলবে না। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির মধ্যে ভাগ করে কোনো কোনোটা একাধিকবারও শেখাতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এসব শিক্ষা মুখস্ত করালে হবে না, কর্মের মাধ্যমে ব্যবহারিকভাবে শেখাতে হবে।

মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা: সেই আদিকাল থেকে মানবজাতিকে এ ভূ-পৃষ্ঠে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম মানুষের কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনায় সুষ্ঠু মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে। মানবিক গুণাবলী শিক্ষাই মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা। এমন কোনো ধর্ম নেই, যার মূলমন্ত্র ও অবস্থান বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবতার বিরুদ্ধে। মনুষ্যত্ব আছে বলেই আমরা মানুষ। ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও শিক্ষা আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করে। ধর্ম স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য পালন ছাড়া আর কিছুই না। শিক্ষায় ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষাকে ধর্মবিচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। শিক্ষায় সেক্যিউলারিজম এনে শিক্ষাকে ধ্বংস ও মানবজাতিকে

লক্ষ্যচ্যুত করা হয়েছে। আমরা ভোগবাদে আসক্ত হয়েছি। সেক্যিউলারিজম হলো: 'নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ'। তা হবে কেন? নৈতিকতা ও শিক্ষার মূলে যদি ধর্মই না থাকে তবে অধর্ম ও অবিচার এসে সেখানে বাসা বাঁধতে বাধ্য। সেক্যিউলারিজমকে আমাদের দেশে বাংলায় আমরা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলে থাকি। মূলত আমি ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সকল ধর্মের প্রতি উদাসীনতা বুঝি। নিরপেক্ষতা বলতে বাংলা অভিধানে পক্ষপাতশূন্যতা (কোনো পক্ষেই নয় এমন); স্বাধীনতা; স্বাতন্ত্র্যকে বোঝানো হয়েছে। ধর্ম অর্থ ধৃ+মন, অর্থাৎ মন মূল যে অনুমান মনে ধারণ করে রাখে। মন যদি চুরি-ডাকাতি করা ভালো এই অনুমান ধারণ করে রাখে, তাকে তো আর ধর্ম বলা যায় না। এভাবে একজন মানুষ যদি তার অবৈধ রোজগারকে মনে মনে বৈধ বলে মনে ধারণ করে রাখে, তাহলে অবৈধ রোজগার তো আর বৈধ হয়ে যায় না। যদি এমনটি হয়, তাকে মানুষ বাদে অন্য কোনো প্রাণি বলাই সঙ্গত। সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশকে যে কোনো ধর্ম স্বীকৃতি দেয়, এটাও মানবিক ধর্ম। মানবিকতাকে বাদ দিয়ে মানুষ নাম ধারণ করা যায় না। ধর্ম ছাড়া মানবিক গুণাবলী অর্জন অনস্বীকার্য। তাই মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্ম-উদাসীন বা ধর্ম-স্বাতন্ত্র্য) হতে পারে না। Secularism-এর সমার্থক হিসেবে বাংলা ভাষায় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দ ব্যবহার করা হয়। Secular-শব্দের অর্থ Oxford Advanced Learner's Dictionary- তে করা হয়েছে এভাবে: ১.`not connected with spiritual or religious matters'. ২. `living among ordinary people rather than in a religious community.' পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, 'সেক্যিউলার' শব্দ ধর্মের সাথে সম্পর্কীত কোনো শব্দ না, বরং ধর্মবিবর্জিত শব্দ। তেমনিভাবে, Secularism শব্দের অর্থ করা হয়েছে এভাবে:`the belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc. তাই আমরা সেক্যিউলারিজম শব্দ বজায় রেখে ধর্মের সাথে শিক্ষাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যতই সম্পর্কীত করার চেষ্টা করি না কেন, এ প্রচেষ্টা সাংঘর্ষিক। আমার দৃষ্টিতে ধর্ম ছাড়া শিক্ষার ধারণা নিরর্থক। শিক্ষাকে ধর্মছাড়া করার অর্থ হচ্ছে, শিক্ষার হাত-পা কেটে ফেলা। যে শিক্ষা মনুষ্যত্বের সঞ্চারণ করে না, সে শিক্ষা বাতিল। আবার ধর্ম ছাড়া মনুষ্যত্বের সঞ্চারণইবা কীভাবে হবে? ধর্ম মানে মানবজাতির দৈনন্দিন

জীবনবিধান বা নীতিমালা। আবার শিক্ষা লাভ করা ধর্মের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহলে ধর্ম ছাড়া শিক্ষা কীভাবে চলতে পারে? আমরা আখেরাতভিত্তিক ধর্মকে পালন করি; যদিও ধর্মটা দুনিয়াভিত্তিক। ধর্ম ছাড়া মানুষকে শিক্ষা না দিয়ে চতুষ্পদ কোনো প্রাণীর জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা যায়। বাস্তব একটা উদাহরণ দেই। এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে, তার অনেক সেন্টারের নকল সরবরাহকারী হচ্ছে শিক্ষকরা। তারা পরীক্ষা শুরু হবার আধা ঘণ্টার মধ্যে প্রশ্নটা বাইরে নিয়ে যায় এবং পার্শ্ববর্তী কোনো ঘরে বসে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে যে সব ছাত্রছাত্রী আগে তাদের টাকা দিয়ে রেখেছে পরীক্ষার হলে তাদের সরবরাহ করে। অনেক হেডমাস্টার ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষকেও আমি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিতে শুনেছি, তারা প্রশাসনে তাদের সহায়তাকারীসহ মোটা অঙ্কের টাকাটা ভাগ করে নেয় এবং সেন্টারে নকল চলতে সহায়তা করে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককেও অকল্পনীয় জঘন্য দুর্নীতি করতে দেখেছি। এই হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষায় নৈতিকতা। বেড়ায়ও খেত খেয়ে যাচ্ছে। এদের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা কী শিখবে! অনেক শিক্ষকের মধ্যে নৈতিকতার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। মনুষ্যত্বের গুণাবলী নেই, আবার মানুষ গড়ার কারিগর। বর্তমান সমাজের অভ্যন্তরভাগ বড্ড কদাকার। অধিকাংশ মানুষের মুখের কথার সাথে বাস্তব কাজের কোনো মিল নেই। বরং আসল রূপটা প্রকাশ পেলে গা শিউরে ওঠে। এটা কি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত? এই যদি বাস্তব পরিস্থিতি হয়, সে সমাজ চলে কী করে? অনেকে মুখে লোক দেখানো অনেক বড়বড় কথা বলবে কিন্তু এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে মন থেকে কোনো চেষ্টাই করবে না। তাই মানুষকে শিক্ষা দিয়ে সুশিক্ষিত বানাতে গেলে তার মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ থাকতেই হবে। মনুষ্যত্বের বুনিয়াদ ধর্ম, শিক্ষার মূলও ধর্ম। ধর্ম না থাকলে শিক্ষা থাকে না। বর্তমানে আমরা ধর্মকে অধর্মের কাজে বেশি ব্যবহার করছি। শিক্ষা না থাকলে মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী সর্বাধম বা সর্বাপেক্ষা ইতর প্রাণীতে পরিণত হয়ে যায়। ধর্মগ্রন্থের প্রথম কথা হচ্ছে: 'পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। ... পড়ো (অধ্যয়ন করো), আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে

জানতো না।' (সূরা আল আ'লাক; ৯৬: ১,৩,৪,৫)। সেক্যিউলারিজম-নির্ভর মানবসভ্যতা শিক্ষাকে ধর্মছাড়া করতে গিয়ে মানবগোষ্ঠী শিক্ষাছাড়া হতে চলেছে। ধর্মের মোদ্দাকথা পার্থিব জীবনে শুদ্ধাচার, এর কর্ম ও চিন্তাচেতনাকে নিয়ে। মূলত পরকালে কোনো ধর্ম নেই। ধর্ম পার্থিব জীবনকে সম্পৃক্ত করে, আবার সেক্যিউলারিজম ধর্মকে শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়িয়ে পরকালের উদ্দেশে বিদায় কওে দিতে চায়। এটা কীভাবে সম্ভব? এটা স্ববিরোধীতা নয় কি? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেক্যিউলারিজম শব্দের বাংলা ধর্মনিরপেক্ষতা ঠিক আছে, তবে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ব্যাখ্যা অভিধানে দেওয়া আছে তা আদৌ ঠিক নয়। এটা দ্ব্যর্থবোধক কিংবা বিভ্রান্তিকর। বাংলা একাডেমির অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে এভাবে অর্থ করা হয়েছে: 'যে মতবাদে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয়রূপে গণ্য করা হয় এবং রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না; যে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যবহার করে না।' ব্যাখ্যাটা মেনে নেওয়া যায়। এই ব্যাখ্যার শব্দ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার এ ব্যাখ্যার সাথে সেক্যিউলারিজম শব্দের ব্যাখ্যার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আমি বাংলা একাডেমির অভিধানের ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ না করলেও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যার সাথে একমত হতে পারি না। অথচ এ বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যাকে পরিহার করে সহজিকরণ করা সম্ভব। আমরা সেকিউলারিজম শব্দের বাংলা 'ইহজাগতিকতাবাদ' বা 'ইহবাদ' বা ধর্মনিরপেক্ষতাও বলতে পারি। আর যে অর্থে আমরা অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করেছি, সেদিক বিবেচনায় ব্যখ্যাকে ঠিক রেখে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটাকে বাদ দিয়ে 'ধর্ম-অহিংসতা' বা 'ধর্ম-সহৃদয়তা' দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারি। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা একটা 'না-বোধক' অর্থ প্রকাশ করে। এতে বিভ্রান্তি দূর হয়। কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করাই সঙ্গত এবং ধর্মকে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণ হিসেবে গণ্য করাই উচিত। শিক্ষা শেখে ব্যক্তি, রাষ্ট্র নয়। সেজন্য ব্যক্তিকে সুশিক্ষিত করতে এবং ব্যক্তির জীবন গড়তে শিক্ষা থেকে ধর্মকে পৃথক করা ও ধর্মশূন্য করা আদৌ উচিত নয়। একজন ধার্মীক ব্যক্তি পরকালের কল্যাণের আশায় ইহকালে কল্যাণমূলক কাজ করে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ। মানুষকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গেলে

মনের মনিকোঠায় ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় বিশ্বাসের বীজ রোপন করা প্রয়োজন। এই ধর্মীয় শিক্ষার বীজ অঙ্কুরোদ্‌গম হয়ে মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষায় রূপ নেয়। নইলে মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা যতই মুখস্ত করানো হোক না কেন, বাস্তবতা হবে ভিন্নরূপ। 'ছাগল ধরিয়া যদি বলো কানে কানে, চরিতে না যেও বাবা ফলের বাগানে'। ছাগল যা করার তা করবেই। ধর্মহারা শিক্ষার্থীকে মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা শেখানোর ফলও তেমনই হতে বাধ্য। ধর্মের দুটি দিক। একটি আনুষ্ঠানিকতা; অন্যটি আধ্যাত্মিকতা। এদেশের মানুষ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় বেশি অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে; যেমন– নামাজ পড়ছে, আবার ঘুষও খাচ্ছে; নামাজ পড়ে উঠেই পাপাচারে মগ্ন হচ্ছে; নামাজ পড়ছে, আবার মিথ্যাচার করছে। নামাজে দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা সেজদায় যে কথা বলে বারবার প্রতিজ্ঞা করছে, নামাজ থেকে উঠেই সে-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছে। ঘুষ না খাওয়া, পাপাচার না করা, মিথ্যা না বলা প্রভৃতিও যে ধর্ম, সে-কথা আমরা হারাতে বসেছি। বছরের পর বছর নিয়মিত রোজা রাখছে, আবার মনটাকে ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত করতে পারছে না। এদেশে শিক্ষায় ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা ও কর্মের সংশোধনের ওপর বেশি জোর দিতে হবে। এদেশে মানুষকে মূল্যায়ন করা হয় ব্যক্তির রাজনৈতিক দল বিবেচনা করে, যদিও হওয়া উচিৎ কার মধ্যে সুশিক্ষা ও মনুষ্যত্বের মাত্রা কতটুকু আছে তার উপর ভিত্তি করে।

আলো না থাকলে আঁধার থাকাটাই স্বাভাবিক, তেমনি মানুষের মনের মনিকোঠায় ধর্ম ও নৈতিকতা না থাকলে অধর্ম ও দুর্নীতি থাকাটাই অনস্বীকার্য। মানুষের মন থেকে মনুষ্যত্ব যত দূরে সরে যাবে, মানুষ তত স্বার্থবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, ভোগবাদ ও বন্যপ্রাণী-সাদৃশ হয়ে উঠবে। যে শিক্ষায় সততা, আদর্শ ও মনুষ্যত্ব নেই, নৈতিকতা নেই– সে শিক্ষা মূল্যহীন ও অচল। একমাত্র মনুষ্যত্বই পারে এ ভূ-পৃষ্ঠে মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখতে। নৈতিকতা পারে এদেশের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিকে শীর্ষে পৌঁছে দিতে। এজন্য মনের গভীরে ধর্মীয় বিশ্বাসের অস্তিত্ব থাকা জরুরি।

বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রতিটি দেশের শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে সিএসআর, কোড অব কর্পোরেট এথিক্স, কোড অব প্রফেশনাল এথিক্স, বিজনেস এথিক্স ইত্যাদি নামে

অনেক কোর্সই পড়ানো হচ্ছে। এগুলো ধর্মের আংশিক কাগুজে প্রতিস্থাপন। ধার্মিকতা শব্দটা এড়িয়ে গিয়ে বা ধর্মকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে আইন ও নিয়ম আকারে ভিন্ন নামে এগুলোকে চালু করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভ থেকে ব্যক্তির মনের গভীরে ধর্মের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণের বীজ ভালোমতো প্রথিত না-হয়ে থাকার কারণে এথিক্সের সব মুখস্তবিদ্যা কাগুজে বাঘ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এতে সমাজে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে মনুষ্যত্বহীন শিক্ষা ফলপ্রসূ হচ্ছে কী-না এবং কোনো ভালো কিছু করতে পারছে কী-না আমরা সকলেই তা অবহিত। এ জন্য ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই ধর্ম ও মনুষ্যত্বের বীজ বপন করাটাই যুক্তিযুক্ত। মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা বলতে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলে এমন শিক্ষা বলা যায়। শিক্ষিত মানুষ জাগ্রত-শাণিত বিবেকের অধিকারী হতে হবে। বিবেকহীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতা থেকে সব অন্যায় ও অবিচারের জন্ম। মানুষের মনের অন্ধকার ও অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে তার মধ্যে সুবিচারের ক্ষমতা ও বোধশক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষ নিজেই তার বিবেককে কাজে লাগিয়ে নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। আত্মশুদ্ধি মানেই বিবেক বৃদ্ধি– জাগ্রত বিবেকের সৃষ্টি। ধর্মগ্রন্থে এসেছে, 'নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে– যে নিজের নফস বা আত্মাকে কলুষতা থেকে মুক্ত করেছে। আর সে অকৃতকার্য হয়েছে, যে নফসকে কলুষিত করেছে'। (সূরা শামস: আয়াত ৯-১০)।

ন্যায়নিষ্ঠা, মানবসেবার মনোভাব, দেশপ্রেম, সমাজসেবা, দেশসেবা, নৈতিকতা, সততা, আর্ত-মানবতার সেবা, চারিত্রিক অখণ্ডতা (ইন্টিগ্রিটি), বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, স্বচ্ছতা, সৎকর্মপরায়ণতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, প্রতিহিংসা-মুক্ততা, ধর্ম-অহিংসতা, অকৃত্রিমতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য, জেনেশুনে সত্য গোপন না করা, শঠতা-চৌর্যবৃত্তিহীনতা ও কুটিলতা পরিহার করা প্রভৃতি সবই মনুষ্যত্বের গুণ। এ গুণগুলো মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে মহিমান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে– মানুষের মধ্যে এসব গুণের অনুপস্থিতি এদেশকে ও সমাজকে ভোগাচ্ছে। এসব গুণ যত বেশি ছাত্রছাত্রী ও মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যাবে, ততই ব্যক্তি, সমাজ

ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে। দেশের প্রতিটা পর্যায়ে মানুষ আইনের শাসন, সুনীতি ও ন্যায়বিচার পাবে। রাজনৈতিক উৎপীড়ন, লুটপাট, আইনহীনতা ও নৈরাজ্য থেকে দেশ রক্ষা পাবে। এভাবেই আদর্শ মানুষ কর্তৃক আদর্শ-জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এসব গুণকে ছাত্রছাত্রীদের মনের গহনে ছোটবেলা থেকেই স্কুলে ও বাড়িতে বাস্তব ট্রেইনিং আকারে বারবার গেঁথে দিতে হবে এবং প্রাকটিস করাতে হবে।

কর্মমুখী শিক্ষা: শিক্ষা মানুষকে কোনো না কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অনেকেই একই ধরনের কাজ করলে সেটা একটা পেশাতে পরিণত হয়। প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো পেশা থাকতে হবে, যেখান থেকে উপার্জিত অর্থ বা রোজগার দিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করবে। অন্য কোনো প্রাণী প্রকৃতি থেকে খাবার সংগ্রহ করে খেয়ে বেঁচে থাকে। মানুষকে প্রয়োজনানুযায়ী মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনসামগ্রী সংগ্রহ করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয়। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের এমন কিছু শেখার প্রয়োজন, যে শিক্ষা ব্যবহার করে জীবিকার্জন করা ও ভালোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব। পেশাগত শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজে, সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হয়। পেশাগত কর্ম সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটায়। মানুষ কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে সৃষ্টির কল্যাণ করে পরকালের কল্যাণও নিশ্চিত করতে পারে। এজন্য কাউকে মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে কোনো টেকনিক্যাল কিংবা ভকেশনাল শিক্ষায় ট্রেইনিং নিয়ে পেশা বেছে নিতে হবে। কেউবা উচ্চশিক্ষা অর্জন করে উচ্চ কোনো পেশায় যাবে। সার্টিফিকেটসর্বস্ব কোনো উচ্চশিক্ষা অর্জন করে বেকারত্বের গ্লানি ভোগ করার চেয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে কোনো পেশাদার হওয়া কিংবা ব্যবসা করা অনেক ভালো। অনেকেই সার্টিফিকেটসর্বস্ব টেকনিক্যাল বিদ্যাধারী হচ্ছে। এতে কোনো লাভ হচ্ছে না। বাস্তবতা হচ্ছে, যে সার্টিফিকেট না নিয়েও ব্যবহারিক কাজে দক্ষতা দেখাতে পারছে, সে টাকা রোজগার করে ভালো আছে। অনেক টেকনিক্যাল বিদ্যাধারীকে আমি ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে অন্য কর্মান্বেষীদের সাথে নিয়ে ভালোভাবে ব্যবসা করতে দেখেছি। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়ে তাকে মনমতো পেশার দিকে আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। এ দায়িত্ব তার শিক্ষকের। এদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে লাখ লাখ

টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। অসুবিধা হচ্ছে সেখানে হাতে-কলমে কাজ শেখানো হয় না। সার্টিফিকেট বিলি করা হয়। এ অবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শক্ত কোনো ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত অবস্থার কোনো পরিবর্তন আশা করা যায় না। প্রাইমারি, হাইস্কুলসহ কলেজেরও একই অবস্থা। এটাও একটা দুষ্টচক্র (ভিশাস সার্কেল)। এই দুষ্টচক্রের কারণে দেশে জাত শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এভাবেও শিক্ষা-পরিবেশের ক্রমাবনতি ঘটছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, মানুষ যেটাতে একবার অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেখান থেকে বেরিয়ে সহজে নতুনকে গ্রহণ করতে চায় না, এমন সংখ্যা শতকরা আশি ভাগের উপরে।

উচ্চশিক্ষার অবস্থাও বেশ খারাপ। এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ার ভিত গড়ে না উঠলে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা আয়ত্ব করা কঠিন হয়। এটাও এদেশের বাস্তবতা। ফলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার স্বার্থে মান কমাতে বাধ্য হয়। হাতে গোনা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়েও ইন্ডাস্ট্রী-কোল্যাবরেশন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, সেখানেও পেশাগত শিক্ষা দেওয়া যায়, এদেশে বাস্তবে তা হয়ে ওঠে না। সেখানে যারা ভর্তি হয়, অধিকাংশই নিজ কিংবা পারিবারিক চেষ্টায় স্কুল-কলেজে ভালো লেখাপড়া শিখে আসে। বাকিরা মাতৃভাষা বাংলাটাও ভালোমতো পড়তে ও লিখতে পারে না। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব নেই। সেখানকার শিক্ষামানের কথা বললে ইঁদুরও ফিক করে হেসে গর্তে লুকাবে।

যাহোক, এদেশে শিক্ষা মানের উন্নতি এতটা সহজ নয়। পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস যেমনই হোক, বাস্তবায়ন পর্যায়ে ব্যপক পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় নতুনত্ব ও দায়িত্বশীলতা আনতে হবে। শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, স্কুল পর্যায়ে এমন অগণিত শিক্ষক আছে যারা ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা, 'শিক্ষকদের জন্য প্রণীত ম্যানুয়াল'টাও পড়ে ঠিকমতো বুঝতে অপারগ। তাদের ট্রেইনিং দেওয়া, না-দেওয়া একই কথা। যে দুধ ঘোলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, 'হাজার কষেতে ঘোল না হয় মাখন'। প্রয়োজনে টাকা বেশি দিয়ে হলেও সুশিক্ষিত জাত শিক্ষকের সন্ধান করতে হবে। শিক্ষার নিয়োগব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব দূর করতে হবে। জাত শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল হলে,

অজাত শিক্ষকদের পরিবেশে থেকে অধিকাংশ সময় তারা ফলপ্রসূ তেমন কিছু করতে পারে না। এজন্যই অনুকূল প্রশাসনিক পরিবেশ অবশ্যম্ভাবী, এদেশে যার অভাব উল্লেখ করার মতো। রাজনৈতিক দ্বৈত-মান বাদ দিয়ে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও আইনের শাসন যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে। নইলে শিক্ষার মান কোনোক্রমেই বাড়বে না। জীবন বাঁচাতে শরীরের কোনো বিশেষ অঙ্গচ্ছেদ করা লাগতে পারে, সেটাকেও মেনে নিতে হবে। নইলে ভয়াবহ পরিণতি আসবেই। তা আমরা পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি যতই পরিবর্তন করি না কেন। আমরা সবাই অবহিত যে, এ অবস্থা আমরা দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক চাটুকারিতা, সস্তা জনপ্রিয়তা পেতে উদারতা দেখিয়ে ও অব্যবস্থাপনা দিয়ে অর্জন করেছি।

কর্মমুখী শিক্ষার জন্য প্রাইমারির অন্তত ৫ম শ্রেণি থেকেই গণিত, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায় শিক্ষা ও সামাজবিজ্ঞান শিক্ষার ওপর শ্রেণিভেদে বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। অষ্টম শ্রেণির মধ্যেই অন্তত বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ওপর দক্ষতা আনতে হবে। বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষায় বেশি দুর্বল, ইংরেজির অবস্থা আরো খারাপ। বাংলা মাতৃভাষা এবং ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করতে হবে। ভাষার ওপর বেশি জোর দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের নিজে নিজে টেক্সট বই পড়ে বোঝার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। নোট বা গাইড বাদ দিয়ে নিজের ভাষায় লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পড়ার টপিক নিয়ে পড়ার সাথে সাথে ভাবার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র ব্যক্তিগত টিউশনি, কোচিং-বাণিজ্য ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাশীলতা, জ্ঞানান্বেষণ, অনুসন্ধান, পাঠ্যবই পড়ে নিজে নিজে শেখার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নির্মূল করে দিচ্ছে। কোচিং ব্যবসার দুর্বলতা এখানেই। উচ্চ-শ্রেণিতে ওঠার আগে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সেই শ্রেণিতে পড়ার উপযুক্ত মেধার বিকাশ হতে হবে। মুখস্ত বিদ্যায় যা কখনো হয় না। ছাত্রছাত্রীদের ভাবনা ও মেধার বিকাশ হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীরা মেধা বিকাশের চর্চা করছে না, শুধু পড়া মুখস্ত করছে। মেধা, চিন্তাশীলতা, জ্ঞানানুসন্ধান যতদিন পর্যন্ত ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা না হবে, ততদিন শিক্ষার মান বাড়বে না। যে কোনোভাবে শিক্ষকের নোট কিংবা বাজারের নোটবই মুখস্ত করার এ আত্মঘাতি বদভ্যাস ও সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কীইবা এমন কর্মমুখী শিক্ষা শেখানো যায়! মূলত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে কর্ম ও বিভিন্ন পেশায় অনুপ্রাণিত করতে হবে, কর্মজীবন গড়ার স্বপ্ন মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। অন্তত তৃতীয় শ্রেণি থেকে প্রত্যেক শ্রেণিতে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। গণিত, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়সহ বাংলা ও ইংরেজির ওপর অনেক জোর দিতে হবে এবং লেখাপড়া মুখস্ত না করিয়ে বিষয় নিয়ে ভাবনা ও চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে হবে। শিক্ষার বিষয়গুলো যাতে ছাত্রছাত্রী বাস্তবে ব্যবহার করতে পারে সে-দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটা পড়ারই তাকে বাস্তব উদাহরণ দিতে পারতে হবে। উচ্চশিক্ষায় ভালো কিছু না করতে পারলে টেকনিক্যাল শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গিয়ে যাতে তারা সকার হতে পারে সে কথাটা তাদের বারবার বুঝিয়ে বলতে হবে। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রছাত্রীদের মোটিভেশনের কোনো বিকল্প নেই।

সাত: পাঠ্যক্রম ও পরিশেষ

শিক্ষায় পাঠ্যক্রম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, তারপর এর প্রয়োগ। শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে বিস্তৃতভাবে তৈরিকৃত শিক্ষা-পরিকল্পনা। কার্যত পাঠ্যক্রম ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানের আওতা, পদ্ধতি, লেখাপড়ার ধরন, শারীরিক ও মানসিক অনুশীলন, ক্রিয়াকলাপ, অধ্যয়নের উপাদান, মূল্যায়ন-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়কে সম্পৃক্ত করে। এর বেশ কিছু বিষয় আগেই আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার পূর্ব-প্রকাশিত বই 'সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম এবং ছোটগল্পের বইয়ের কোনো কোনো গল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন নিয়ে অনেক কথাই লিখেছি। একই কথা বার বার লেখার প্রয়োজন নেই। আমার ধারণা যে, ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, যে কোনো ধর্মীয় উগ্রতা, পুরোহিততন্ত্র, মাদ্রাসা-পাস জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব, ছদ্মবেকারত্ব, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিহীন শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষায় দেশের জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও যথার্থ মানবসম্পদ করে গড়ে তুলতে হলে একাঙ্গীভূত (ইন্টিগ্রেটেড) শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়াও ঐ লেখাগুলোতে শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ সে-সব লেখা পড়ে দেখতে পারেন। তবে অসার ভোগবাদী, বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদীদের পরামর্শ ও কথায় ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা এবং উন্নত দেশ ও জাতি গড়তে চাইলে তা পরীক্ষিত কারণেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা অলীক কল্পনা মাত্র। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষা থেকে ধর্ম ও নৈতিকতাকে বাদ দিলে পুরো সমাজ অচিরেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। কারণ ধর্ম মানে মানুষের সকল মানবিক গুণাবলির সম্মিলন ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনব্যবস্থা– তা যে ধর্মই হোক।

আমি এখানে পুরো পাঠ্যক্রম রচনা করতে চাইনে। এ-বইতে মূল শিক্ষার উপাদানগুলো এবং চিন্তার অভিমুখিতা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরতে চাই। শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা ও আদর্শ পেতে চাই। শিক্ষাব্যবস্থাকে এ অধঃপতন থেকে রক্ষা করে মানোন্নয়নের জন্য কিছু পরামর্শ দিতে চাই এবং একাঙ্গীভূত

(ইন্টিগ্রেটেড) শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা সম্ভব– এটা দেখাতে চাই। এ নিয়েই 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা'। এ ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থী অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি, একই শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা ও যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মানসম্মত শিক্ষা নিয়ে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় কিংবা কারিগরি শিক্ষায় স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জনের জন্য যেতে পারবে এবং শিক্ষার গুণগত মান ফিরে আসবে। বিভিন্ন মুসলিম দেশসহ অন্যান্য দেশেও এভাবেই শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজানো হয়েছে। এ লক্ষ্যে এবার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠপরিক্রমা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

সকল স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ১০০, ইংরেজি ১০০, গণিত ১০০, পরিবেশ পরিচিতি ১০০, চারু ও কারুকলা ১০০ নম্বর সকলের জন্য বাধ্যতামূলক পাঠ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে এর সাথে আরো দুটো বিষয়– বাংলাদেশ পরিচিতি ১০০, এবং দৈনন্দিন বিজ্ঞান ১০০ নম্বর বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। ধর্মীয় শিক্ষা ও মানব গুণাবলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এখনো স্কুলে ১০০ নম্বরের ধর্মশিক্ষা পড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা কতটুকু শিখছে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এমনকি ধর্ম-বইটাও পড়তে শিখছে না। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলাম ধর্মানুসারীদের জন্য কোরআন মজিদ ও তাজভিদ ১০০ এবং আকাইদ ও ফিকহ ৫০ ও আরবি ৫০ নম্বর পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অন্য ধর্মানুসারীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ ১০০ এবং মানবধর্ম ও নৈতিকতা ১০০ পড়ানো যেতে পারে। ধর্ম বিষয় পড়ানোর সময় পড়াটা মুখস্থভিত্তিক না হয়ে ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা যেন কোমল শিশুমনে পুরোপুরি গেঁথে যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ধর্মশিক্ষাকে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বজনীন করে দিতে হবে। এতে শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি সমাজ থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি অনেকটাই চলে যাবে, সমাজ পুরোহিতবাদ থেকে মুক্তি পাবে। কেউ ধর্মীয় বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে চাইলে যে-কোনো স্কুলের পড়া থেকেই তা করতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য বাংলা ১০০, ইংরেজি ১০০, সাধারণ গণিত ১০০, সাধারণ বিজ্ঞান ১০০ এবং তথ্য ও যাগাযোগ প্রযুক্তি ১০০ নম্বর। এছাড়া

ইসলাম ধর্মানুসারীদের জন্য কোরআন মজিদ ও তাজভিদ ১০০ এবং আকাইদ ও ফিকহ ১০০; অন্য ধর্মানুসারীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ ১০০ এবং হিন্দু/খ্রিস্ট/বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিকশিক্ষা ১০০ বাধ্যতামূলক করা যায়। ঐচ্ছিক বিষয়: স্পোকেন ইংলিশ; র‍্যাপিড ইংলিশ; এসো জীবন গড়ি; আরবি ভাষা; হিফজুল কোরআন; এ দেশের সমাজব্যবস্থা; ভূগোল-প্রথম পাঠ (বাংলাদেশ) প্রভৃতি কোর্সগুলোর মধ্য থেকে তিনটি বিষয় ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচন করে নিতে পারবে। মোট ১০০০ নম্বরের দশটি বিষয়ের পরীক্ষা হবে। তবে কোনো কোর্সেরই পাঠ্যসূচির আওতা যেন খুব বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে সাতটি কোর্স স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য বাধতামূলক করা যায়। সেগুলো হলো: বাংলা ২০০, ইংরেজি ২০০, সাধারণ গণিত ১০০, সাধারণ বিজ্ঞান ১০০ এবং তথ্য ও যাগাযোগ প্রযুক্তি ১০০ নম্বর। প্রতিটি শ্রেণিতে মোট ১০০০ নম্বর বিষয়ের জন্য পড়াশোনা করবে। কোনো পর্যায়েরই পাঠ্যসূচি ব্যাপক করা যাবে না।

সপ্তম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয়: স্পোকেন ইংলিশ; র‍্যাপিড ইংলিশ; বড় যদি হতে চাও; বিখ্যাতজনদের জীবনকথা ও শিক্ষা; ভূগোল-দ্বিতীয় পাঠ (বাংলাদেশ); কোরআন মজিদ ও তাজভিদ; আকাইদ ও ফিকহ; আরবি ভাষা; হিফজুল কোরআন; হিন্দু/খ্রিস্ট/বৌদ্ধধর্ম ও মানবতা; এদেশের সমাজব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার; খেলাধুলা ও শরীরচর্চা; কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্স; গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি কোর্সগুলোর মধ্য থেকে তিনটি, ইচ্ছে করলে একটি অতিরিক্ত কোর্সও নিতে পারে। স্কুল-মাদ্রাসার পার্শ্ববর্তী এলাকায় টেকনিক্যাল ও ট্রেড কোর্সে কর্মরত ব্যক্তি বা কোনো কারখানা থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা শিক্ষানবীশ হিসাবে সারা বছর কাজ শিখতে পারে। যেমন– পার্শ্ববর্তী একটা দরজির দোকান থেকে শিক্ষার্থী টেইলারিংয়ের কাজ শিখতে পারে। কোনো কারখানা থেকে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ, মোবাইল ফোন মেকানিকের দোকান থেকে ফোন মেরামতের কাজ শিখতে পারে; এমনই অনেক কারিগরি ও ট্রেডের কাজ। একজন শিক্ষক এটা সুপারভাইজ করা ও পরীক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন। এসব কাজের সুপারভাইজ করা নিয়ে যেন আবার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা শুরু না হয়ে যায়– তা লক্ষ রাখতে হবে। আমাদের অভ্যাস

তো আবার যে কোনো কিছুকে উপলক্ষ্য করে টাকা কামানোর চেষ্টা এবং না-শিখিয়েই নামমাত্র একটা সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া। শিক্ষায় নৈতিকতা শেষ মানে মানুষ-জীবনই শেষ। শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মানবতাবোধ-সম্পন্ন মানসম্মত জনগোষ্ঠী তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়েই-না এতো শিবের গীত গাচ্ছি।

অষ্টম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয়: বাংলাদেশ স্টাডিজ ও বিশ্বসভ্যতা (প্রাথমিক অংশ); অর্থনীতি (প্রাথমিক); পৌরনীতি (প্রাথমিক); স্পোকেন ইংলিশ; র‍্যাপিড ইংলিশ; বিজ্ঞানীদের জীবনী; বিখ্যাতজনদের জীবনকথা ও শিক্ষা; কোরআন মজিদ ও তাজভিদ; আকাইদ ও ফিকহ; আরবি ভাষা; হিফজুল কোরআন; হিন্দু/খ্রিস্ট/বৌদ্ধধর্ম ও মানবতা; সিভিল ডিফেন্স; কৃষি শিক্ষা; খেলাধুলা ও শরীরচর্চা; কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্স; গার্হস্থ্য বিজ্ঞান; ভূগোল-তৃতীয় পাঠ (এশিয়া মহাদেশ) প্রভৃতি কোর্স থেকে তিনটি, ইচ্ছে করলে চারটিও নিতে পারবে। পাঠ্যসূচির আওতা অষ্টম শ্রেণির উপযোগী করে তৈরি করতে হবে। বালাদেশের ইতিহাসের শেষ অংশ নবম শ্রেণিতে দেওয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন শ্রেণির জন্য কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি ও অঙ্ক বইসহ অন্যান্য বই আমি দেখেছি। বইগুলো সংশ্লিষ্ট শ্রেণির জন্য মানসম্মত নয়। ঐ বই পড়ে সাধারণ স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা সম্ভব নয়। এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত কিছু বইয়ের টেক্সট পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে আলোচনা করে পরিবর্তন করা যেতে পারে। তবে কওমি মাদ্রাসাগুলোতেও প্রতিটা শ্রেণির জন্য এনসিটিবি কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো পড়াতে হবে। এর সঙ্গে কওমি কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে ধর্মীয় বিষয়সমূহ যোগ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটা ছাত্রছাত্রী ইচ্ছে করলেই বিজ্ঞান ও ব্যবসাশিক্ষায় উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষা নিতে পারে। কোনো ব্যবস্থা যেন তাদের প্রতিভা বিকাশে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এতে লাভবান হলে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরাই হবে।

সব ছাত্রছাত্রীর জন্য ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে এবং পরবর্তীকালে ধর্মশিক্ষা বিষয় নিয়ে উপর ক্লাসে পড়ার ব্যবস্থা থাকলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর

ধর্মশিক্ষার ভিত গড়ে উঠবে। মাদ্রাসাগুলোকে তখন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পড়ার মান নিশ্চিত করে টিকে থাকতে হবে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোর্সগুলো বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক হিসেবে দেওয়া হবে, তার বাইরে কোনো কোর্স কোনো বোর্ড স্কুল বা মাদ্রাসায় চালু করতে পারবে না– এ নির্দেশনা সরকারের থাকতে হবে। নবম ও দশম শ্রেণিতে মোট ১০০০ নম্বরের পাঠের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। কোনো শিক্ষার্থী প্রয়োজনমতো ১১০০ কিংবা ১২০০ নম্বর পড়েও এসএসসির সার্টিফিকেট নিতে পারে। যে কোর্সগুলো বাধ্যতামূলক করা দরকার তা হলো: বাংলা ২০০, ইংরেজি ২০০ এবং সাধারণ গণিত ১০০ নম্বর। নবম ও দশম শ্রেণিতে কোনো শাখা থাকবে না। তবে এর পরবর্তী স্তরে যে কোনো শিক্ষার্থী যেন তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা নিতে পারে সে-ব্যবস্থা রেখে ঐচ্ছিক বিষয় সাজানো যেতে পারে। এমনকি ধর্ম বিষয়েও যারা উচ্চশিক্ষা নিতে চায় তারাও যেন মাদ্রাসায় না পড়ে স্কুল থেকেই তার চাহিদামতো বিষয় বেছে নিতে পারে সে-ব্যবস্থাও থাকতে হবে। যারা কুরআন হেফজ করতে চায়, মসজিদের হেফজখানা থেকে তারা হেফজ শুরু করবে। পাশাপাশি কোনো প্রাথমিক স্কুলে বাংলা, ইংরেজি, গণিত কোর্সগুলো করতে থাকবে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্কুলেই হিফজুল কুরআন নামে একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে এবং অষ্টম শ্রেণি পাঠ শেষে হিফজুল কুরআন শেষ হবে। প্রয়োজনে নবম ও দশম শ্রেণিতেও ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে একই কোর্স নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে মার্কস-সার্টিফিকেটে বিষয়টি লিখিয়ে নিতে পারবে। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দু-বার পরীক্ষার মাধ্যমে এসএসসি পাসের সার্টিফিকেট নিতে হবে। নবম শ্রেণি পাঠ শেষে ৫০০ বা ৬০০ নম্বরের বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নেবে। বাকি ৫০০ বা ৬০০ নম্বরের পরীক্ষার জন্য দশম শ্রেণি শেষে অংশ নেবে। দশম শ্রেণি শেষে একবারে সার্টিফিকেট পাওয়ার অধিকারী হবে। এতে শিক্ষার্থীর উপর একবারে পড়ে সব পরীক্ষা দেওয়ার চাপ কমে যাবে। আবার দু-বছরের অধিকাংশ সময় বসে কাটিয়ে শেষের কয়েক মাস নোট মুখস্থ করে পাসের প্রবণতা অনেকাংশে কমে যাবে।

আমি এ দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি, পাঠ্যক্রম ও বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস প্রায় পুরোটাই ভালোভাবে পড়েছি, বিভিন্ন বিষয় লক্ষ করেছি। এগুলো তো অনেক সমৃদ্ধ ও

মানসম্মত। শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই যত কথা লেখা হয়েছে– বিশ্বজয় করার মতো। বাস্তব-প্রয়োগ নিয়েই না যত অসুবিধে। এ দেশে তো কাজির গরুর হিসাব থাকে খাতা-কলমে, গোয়ালে থাকে না– এখানেই মূল সমস্যা। যাকে বলে, 'মাকালের ফল দেখতে ভালো, উপরে লাল ভিতরে কালো' অবস্থা। বুঝতে হবে, বাস্তবে মানের এই নিম্নগতি রোধ করতে না পারলে পরিণতি ভয়াবহ, তা পাঠ্যক্রমে যত ভালো ভালো কথাই লেখা থাক না কেন। বুঝতে হবে, অবস্থারও একটা গতি আছে।

এ পর্যায়ে উল্লিখিত ভিত্তিমূলসহ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি (যারা নিতে চায়) ভাষা লেখা ও বলতে পারার উপরে বেশি জোর দিতে হবে। বাক্য সংযুক্তকরণ, এমসিকিউ ধরনের প্রশ্ন ভাষা শিক্ষা থেকে বাদ দিতে হবে। ভাষাশিক্ষা নির্ভর করে চর্চার উপর– পড়া, লেখা ও বলা বিভিন্নভাবে চর্চা করাতে হবে। তাতে ভাষা শেখার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। মধ্যপ্রাচ্যে এ দেশের লোকের অনেক কাজের সুযোগ আছে। আরবি ও ইংরেজি ভাষা শিখে এবং সপ্তম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত হাতে-কলমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা শিখে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে যাতে কেউ ইচ্ছে করলে অংশ নিতে পারে– সে সুযোগ রাখতে হবে। আরবি ও ইংরেজি ভাষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা শিখে মধ্যপ্রাচ্যে গেলে অন্তত উটের রাখাল কিংবা নির্মাণ-শ্রমিক হিসেবে কাজ করা লাগবে না। দশম শ্রেণির মধ্যেই ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিখিয়ে ফেলতে হবে। অনেক কোর্সেরই চিন্তা-ভাবনা করে ভিন্ন নামও ব্যবহার করা যেতে পারে। ইংরেজি দ্রুতপঠন শিক্ষা, বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও কিছু বাস্তব-নীতিকথা শেখার জন্য কয়েকটা গল্পের সমন্বয়ে 'র‍্যাপিড ইংলিশ' কোর্সটা প্রতিটি ক্লাসে দেওয়া হয়েছে। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে। বাংলা ভাষা-শিক্ষার মধ্যে ভাষার ব্যাকরণ, নিজের ভাষাতে লেখা-রীতি ও শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা বলার উপর বেশি জোর দিতে হবে। ক্লাসে আঞ্চলিক ভাষার রীতি ও ব্যবহার যথাসম্ভব কমাতে হবে। আমি কারো মর্যাদাহানি করতে চাইনে, তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের ক্লাসে পড়ানো এরকম: 'হুন, হুন, কইতাছি হুন। পাহি সব করে রব হাত্র হোয়াইলো, পোরভাত হুসুম হলি হগলি হুডিলো। বুছতাতোস নি? পাহি, পাহি মানি কাওয়া, কাওয়া। হ, পর পর।' এ কিসিমের বাংলা পড়ানো থেকে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা কীই-বা এমন শিখবে, বলুন? 'গমও উদা, যাঁতাও ঢিলা।' এ অবস্থা থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করতে হবে।

পড়ানোর গুরুত্ব দেওয়া ও শেখানোর অনেক উন্নতির বিষয় এ দেশে রয়ে গেছে–'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া'। কারণ আমরা সবাই রাজনীতি নিয়ে মহাব্যস্ত আছি। এ দেশে রাজনীতিই প্রধান সমস্যা ও সম্ভাবনা। আমরা জীবনের সবকিছুকেই রাজনীতির সাথে গুলিয়ে ফেলছি। ভুলটা মূলত এখানেই। মোটকথা বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, শিক্ষা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

এইচএসসি পর্যায়েও এসএসসির মতো বাধ্যতামূলক বাংলা, ইংরেজি কোর্সের সাথে ঐচ্ছিক বিষয়ের কোর্স অফার করতে হবে– যাতে শিক্ষার্থী তার সুবিধামতো কোর্স নিয়ে ভবিষ্যৎ লেখাপড়া-পরিকল্পনা করতে পারে। মোট ১২০০ নম্বরের প্রোগ্রাম হবে। একাদশ শ্রেণি শেষে ও দ্বাদশ শ্রেণি শেষে দু-বার, প্রতিবার ৬০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণি শেষে সার্টিফিকেট পাবে।

সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষা বোর্ডের সাথে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অঙ্গীভূত (মার্জ) করা প্রয়োজন। অভিন্ন সিলেবাসে, একই সাথে, অভিন্ন প্রশ্নে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার বোর্ড পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

এতে প্রচুর ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে মাদ্রাসায়, মাদ্রাসা থেকে স্কুলে ট্রান্সফার হবে। ভয়ের কিছু নেই। প্রয়োজনে স্কুলের বিজ্ঞান, গণিত ও ব্যবসায় শিক্ষার কিছু শিক্ষককে এলাকার মাদ্রাসায় যাবার সুযোগ করে দিন। আবার মাদ্রাসার আরবি ও ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী শিক্ষকদের একটা অংশকে স্কুলে নিয়ে এসে ব্যালান্স করুন। এতে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকবে। প্রয়োজনে নতুন নিয়োগ দিন। সংখ্যা আশানুরূপ হলে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা-বিভাগে মেয়েদের জন্য আলাদা সেকশন খোলা যেতে পারে। এখনো মেয়েদের জন্য আলাদা সেকশনের ব্যবস্থা অনেক স্কুলেই আছে।

স্নাতক শ্রেণি নিয়ে কিছু কথা বলি। কলেজে স্নাতক-সম্মান ও স্নাতকোত্তর পড়ার মান খুবই নীচে নেমে গেছে। সে-সাথে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও। অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ার ভিত্তিমান খারাপ হওয়ার কারণে ভালো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। তারা

আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোনো কলেজে ভর্তি হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক অবস্থা বেশ নাজুক। আওতা অনেক বড়। পত্রিকার খবরে বোঝা যায়, নানা রকমের দুর্নীতিতে এরা জড়িয়ে গেছে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখন গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে, পুনরায় আগের ভাবনাতে ফিরে যাবার দরকার কী-না। অনার্স, মাস্টার্স এবং চার-বছরের প্রোগ্রামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার মানকে বিবেচনায় আনতে হবে। এর কার্যক্রমের গণ্ডি কমিয়ে আনার সময় চলে এসেছে কিনা সেটাও ভাবা দরকার। পুরো দেশের বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম একসাথে চালাতে গিয়ে এটা বেসামাল হয়ে গেছে বলে মনে হয়। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার কোনো মান নেই। ভর্তির ক্ষেত্রেও মান যাচাই নেই– 'কেউ ফেরে না খালি হাতে খাজা রে তোর দরবারে'। এর জন্য ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের পিছনের শিক্ষা ও শেখায় অনিহা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শিক্ষা নিয়ে ব্যবসাকেন্দ্রিক মন-মানসিতাই দায়ী। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে, টাকা আছে সার্টিফিকেট আছে। শিক্ষার মান নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। অভিভাবকদের উচিত হবে খোঁজ-খবর নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো লেখাপড়া হয়, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে সেখানেই ভর্তি করেন, সার্টিফিকেটের চেয়ে শিক্ষার দিকে জোর দেন; যদিও এদেশের অনেক অভিভাবক শিক্ষার মান নিয়ে অনভিজ্ঞ ও উদাসীন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির উচ্চ-শিক্ষার মান ও পলিসি নিয়ে অনেক কিছুই করণীয় আছে। দরকার করণীয়গুলো সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা, কৌশলগত পরিকল্পনা (স্ট্রাটিজিক প্ল্যান) করা। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা। ওয়ার্কিং প্ল্যান করা এবং কাজের সমন্বয় ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি নিয়ে বারান্তরে বলবো। এখন শিক্ষার মানোন্নয়নে অল্প কিছু বলতে চাই, যদিও শত শত পৃষ্ঠা লেখা প্রয়োজন, জানি। শিক্ষায় বাস্তবমুখিতা আনতে হবে– কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা নেই বললেই চলে। ব্যবসায়-শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা অধিক পরিমাণে বাড়াতে হবে। 'বিজনেস অ্যানালিটিকস'সহ কমপক্ষে চারটি কোর্স কম্পিউটারভিত্তিক হওয়া দরকার। এছাড়া অন্যান্য কোর্সেও যেখানে যতটা সম্ভব অধ্যায় অনুযায়ী কম্পিউটারের ব্যবহার প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

প্রযুক্তিগত বিদ্যার উচ্চশিক্ষায় জিইডি কোর্স হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের কিছু বিষয় যেমন– সমাজকর্ম, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, বিশ্ব-ইতিহাস, সমাজ ও ব্যবসায়-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কোর্স নেওয়ার বিধান থাকতে হবে। প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ তো রোবট নয়, তাদেরকে সমাজে চলতে হবে, সমাজে কাজ করতে হবে, প্রযুক্তিবিদ্যা সমাজে প্রয়োগ করতে হবে, প্রয়োজনে এই সমাজে ব্যবসা করতে হবে, সামাজিক জীবন নির্বাহ করতে হবে। সেজন্য তাদের উচ্চশিক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিকের কথা বিবেচনা করে সকল প্রোগ্রামের জন্য 'ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমি কোল্যাবরেটিভ শিক্ষাব্যবস্থা' যথাসম্ভব গড়তে হবে। এটা সময়ের দাবি। প্রতিটা বিষয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত শিল্প-কারখানায় কাজ শিখতে যাবে, শিক্ষকের কাছে শিক্ষা-রিপোর্ট জমা দেবে। প্রতিটা বিষয়ে শিল্প-কারখানা থেকে বিষয়ভিত্তিক প্রফেশনালস এনে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের কোর্সগুলোর জন্য একাধিক ক্লাসরুম-সেমিনার, ক্লাসরুম-ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে। প্রফেশনালসরা ক্লাসরুম-ওয়ার্কশপে হাতে-কলমে শেখানোর জন্য অফিস বা শিল্প-কারখানা থেকে শিক্ষার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নমুনা হিসেবে (ডামি ডকুমেন্ট) ফটোকপি করে কিংবা সফট-কপি করে আনবেন। ছাত্রছাত্রীদের হাতে দেবেন এবং কাজগুলো ক্লাসে প্রতিকী পদ তৈরি করে হাতে-কলমে শেখাবেন। ছাত্রছাত্রীদের শেখা বিষয়ে রিপোর্ট লিখে জমা দিতে বলবেন। এমনটি করতে পারলে আরো অনেক ভালো হয়– প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ৪০-৫০টা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান অধিভুক্ত (এফিলিয়েটেড) থাকবে। কোম্পানির সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমওএ থাকবে। সেসব কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পরামর্শমূলক কাজ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায়) করবে। ছাত্রছাত্রীরা তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে ঐসব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে স্ব-স্ব বিভাগে শিক্ষানবিশ হিসেবে হাতে-কলমে কাজ শিখবে। প্রতিটা ১০০ নম্বর বিষয়ের কমপক্ষে ৪০% নম্বর এজন্য বণ্টিত থাকবে। কোম্পানির কোনো ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীকে ব্যবহারিক কাজ শিখতে হবে। বাকি ৬০% নম্বরের কাজ ক্লাসরুমে শিখে উক্ত বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করবে। একই ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন কোর্স পড়ার জন্য অনেকবার কোম্পানিতে কাজ শিখতে যেতে হবে। এ বিষয়ে কোম্পানিগুলোকে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা অনুসরণযোগ্য নীতিমালা তৈরি করবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনের

মাধ্যমে তা অনুসরণ করবেন। ভালো কর্মদক্ষতা-দেখানো শিক্ষার্থী এভাবে প্রোগ্রাম শেষ করে ঐ সমস্ত কোম্পানিতে চাকরির সুযোগও পেতে পারে। ক্লাসরুমের শিক্ষায় যথাসম্ভব কেসস্টাডি পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা চালু করে দিতে হবে।

উচ্চশিক্ষার পুরোটাই ইংরেজিতে পড়তে হবে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দিচ্ছে, তা বন্ধ করতে হবে। সেজন্য প্রথমেই শিক্ষার্থীর ইংরেজি জ্ঞান যাচাই করে নিতে হবে। প্রয়োজনে 'ইনটেনসিভ ইংলিশ' কোর্স, কমপক্ষে ২০০ নম্বরের চালু করতে হবে। মুখস্থ করে পাস নম্বর পাওয়ার জন্য নয়, ভাষা শেখার জন্য। প্রতিটা প্রোগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'লাইফ স্কিলস্ ফর সাকসেস' নামে একটা ব্যবহরিক ওরিয়েনটেশন কোর্স বা ট্রেইনিং কোর্স চালু করতে হবে। একটু উপর পর্যায়ে গিয়ে 'এমপ্লয়েবিলিটি ফর ম্যানেজারিয়াল অ্যান্ড এন্টারপ্রিনিউর‍্যাল সাকসেস' নামে বা অন্য কোনো নামে আরো দুটো জীবনমুখী কোর্স প্রত্যেক প্রোগ্রামের জন্য অফার করতে হবে। সেগুলো ট্রেইনিং মোডে পড়াতে হবে।

মোট কথা, যে কোনো মূল্যে শিক্ষায় আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মান ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের না-পড়ে বা অসদুপায়ের মাধ্যমে সার্টিফিকেট নেওয়ার মনোভাবকে পরিবেশ ও মানসিকতার উন্নতি করে ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ে প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে। প্রযুক্তিভিত্তিক উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে শিক্ষার্থীকে ঠেলে দিতে হবে (কওমি মাদ্রাসা ও আলিয়া মাদ্রাসাসহ)। আমার হিসাব মতে, এভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালে কয়েক বছরের ব্যবধানে মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। উচ্চশিক্ষা উপযুক্ত শিক্ষায় পরিণত হবে। যাদের প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার দিকে যেতে পারবে। দেশে সুসম শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠবে। দেশ একটা সুনীতি ও মানবিক গুণাবলিতে পূর্ণ সুশিক্ষিত জাতি উন্নয়নের জন্য পাবে।

সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়তে পারলে এ দেশের স্বাধীনতার তিনটি মূলমন্ত্র– মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠা হবে। নইলে অন্য কোনো সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠীর তল্পিবাহক হয়েই শত শত বছর পার করতে হবে। সেজন্য চৈতন্যোদয় যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

এ দেশের জনগোষ্ঠীর শতকরা ছিয়াশি ভাগ বাঙালি মুসলমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন উপেক্ষা করে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমার এ ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাচিন্তা এ দেশে বাঙালি মুসলিম জাগরণে অগ্রদূত হিসেবে একদিন নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ ও সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ শিক্ষাচিন্তায় বাকি চৌদ্দ ভাগ অমুসলিম জনগোষ্ঠীও এ দেশের জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা অনেকটাই সমাজ থেকে দূরীভূত হবে। প্রয়োজন সবাইকে খোলা মন নিয়ে এগিয়ে আসা; গুরুত্ব উপলব্ধি করা; গভীর ক্ষতের উপর হালকা মলম মালিশ করে দিন পার করার চেষ্টা না করা; গোঁজামিল বন্ধ করা। যাঁদেরকে দিয়ে এ কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব, তাঁদেরকেই সে কাজের দায়িত্ব দেওয়া; সুষ্ঠু পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন নিশ্চিত করা। ইচ্ছে করলে এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক চিন্তা ও কর্ম করলে এ জনগোষ্ঠী দিয়েই সবকিছু সম্ভব। 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ-রতন'।

আটঃ গোল-টেবিল আলোচনায় মতামত

৮ জানুয়ারি ২০২২ ইং তারিখে ইউআইইউ মিলনায়তনে ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এন্ড ইকোনোমিক রিসার্চ কর্তৃক আয়োজিত 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা' শীর্ষক গোল-টেবিল আলোচনায় আলোচকবৃন্দের বক্তব্যঃ

অধ্যাপক ড. মো. সাদিকুল ইসলাম– এডভাইজার, স্কুল অব বিজনেস এন্ড ইকোনোমিক্স, ইউআইইউ; এবং অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ফিন্যান্স, ঢাবিঃ স্বাগত বক্তব্যে ড. ইসলাম বলেন, এদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি আছে। আমাদের শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ মৌলিকভাবে দুর্বল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মৌলিক ভিত্তি রচনায় শিক্ষায় দুর্বলতা থাকলে পরবর্তীতে তা প্রকট হয়ে যায়। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান। তাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারছিনে। শিক্ষা নৈতিকতা উন্নয়নে যথেষ্ঠ নয়। শিক্ষায় আমাদের ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করতে হবে। আজকে আমরা ড. হাসনান আহমেদের প্রস্তাবনা শুনবো এবং মতামত দেবো। এত গুণিজন ও শিক্ষাবিদ একসাথে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা সকলকে এ আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম মিয়া– উপ-উপাচার্য, ইউআইইউঃ সুন্দর একটা প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদকে ধন্যবাদ জানাই। বইতে সাধারণভাবে যা আলোচনা করা হয়েছে, এর সাথে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি তথ্যভিত্তিক ডাটা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে বিষয়গুলো আরো সুনির্দিষ্ট হতো। তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম কোথায় কোথায় আমাদের অসুবিধা আছে। আমাদের দেশে শিক্ষা যে খুব খারাপ অবস্থায়– একথা আমি বিশ্বাস করতে চাই না। আমাদের এখান থেকেই অনেক ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে যাচ্ছে। সমস্যা থাকবেই। আমাদের কাদার উপর দিয়ে পার হয়ে চলতে হয়। তারপরও অনেকেই এই কাদার উপর দিয়ে পার হয়েও বাস্তব জীবনে অনেক উপরে উঠে যায়। শিক্ষার ইন্ডাস্ট্রিতে কাঁচামাল হলো আমাদের শিক্ষার্থীরা। উপযুক্ত শিক্ষকরা এই কাঁচামাল গড়ে তুলতে পারে। এজন্য আমাদের দরকার যোগ্য শিক্ষকের। শিক্ষকরা সংসার চালাতে কোচিং করতে বাধ্য হন। তাদের বেতন কাঠামোর দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মূসা– অধ্যাপক, ইউআইইউঃ ড. আহমেদ তথ্য-উপাত্ত দেননি। তবে এটা খালি চোখেও দেখা যায়– এই শিক্ষার মধ্যে একটা অপূর্ণতা

আছে। আমাদের দেশে স্কিল্ড ম্যানপাওয়ার পাচ্ছি না। তারা আনস্কিল্ড বিধায় অনেকেই দেশের বাইরে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। স্কিল্ড হলে হয়তো দেশের বাইরে যেতে হতো না। দেশে বসেই অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারতো, সমাজকে উন্নয়নের সোপানে পৌঁছে দিতে পারতো। ড. আহমেদের বইতে চিন্তার চেয়ে অনেক দুশ্চিন্তার বিষয়গুলো বিবৃত হয়েছে। দুশ্চিন্তার কারণও আছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু মানুষকে নৈতিকভাবে সাবলীল করে না, উন্নত মানুষে পরিণত করে না। আমরা অনেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি, কিন্তু সমাজকে নীচের দিকে নামাতে অনেক কাজ করছি। সেজন্য অনেক উচ্চপদস্থ লোকদের বাড়িতে গেলে কোটি কোটি টাকার সম্পদ দেখা যায়। তারা কানাডার বেগমপাড়া সৃষ্টি করেন ইত্যাদি। এরা কিন্তু সবাই ন্যূনতম ট্রেডিশনাল শিক্ষায় শিক্ষিত। ড. আহমেদকে ধন্যবাদ যে তিনি একটা সমস্যাকে আর্টিকুলেট করে আমাদেরকে দিয়েছেন, একটা প্রস্তাবনা দিয়েছেন, একটা হাইপোথিসিস দিয়েছেন, একটা মডেল দিয়েছেন। মডেলের মধ্যে কি কি থাকা দরকার সেগুলো দিয়েছেন। আমরা যদি একটু চিন্তা করি এবং প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে কন্ট্রিবিউট করতে পারি তাহলে ভালো হয়। আমি দীর্ঘ সময়ে নিজে লেখাপড়া করেছি, শিক্ষক হিসেবে অনেক ভালো ভালো শিক্ষিত লোক গড়েছি। কিন্তুআমরা কি হলফ করে বলতে পারি, প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য ভালো কিছু করতে পারছি? এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমি আমাকে দিতে পারি, আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে দিতে পারি, তাহলে সমাজের অনেক দুর্ভাবনা আছে, দুশ্চিন্তা আছে, যে অরাজকতা আছে– তা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। আমরা আজকে ড. আহমেদের মডেলের বাইরেও কিছু করতে পারি কি-না, শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে পারি কি-না, ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে কি-না, সমাজে নৈতিক ও মানসিকভাবে অবদান রাখতে পারছে কি-না, তা ভেবে দেখতে হবে।

অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দাম হোসেন– উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস: ড. আহমেদ তার বইতে তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষার সাতটা 'আর'-এর কথা বলেছেন; চতুর্থ অধ্যায়ে উন্নয়ন মডেল দিয়েছেন; পঞ্চম অধ্যায়ে পার্টিসিপেটিভ শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলেছেন– আমি মনে করি, এগুলো সবই চমৎকার। তিনি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি জায়গাতে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। এটা একটা ইতিবাচক দিক বলে আমি মনে করি। এর সাথে যদি সাইন্টিফিক রিজনিংটা তুলে ধরতে পারতাম, তাহলে চমৎকার একটা কাজ হতে পারতো। আমাদের দেশে শিক্ষাকে আমরা বাণিজ্যকরণ ও পণ্য হিসেবে নিয়ে যাচ্ছি, এটা দেখা দরকার। আরেকটা বিষয় হচ্ছে– শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অসমতা এবং শিক্ষার মান যে বিশ্ব-মানের

তুলনায় কোথায় নেমে যাচ্ছে, তা দেখা দরকার। আমাদের শিক্ষানীতির আলোকে বিদ্যমান গ্যাপগুলো খুঁজে বের করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব আকারে যদি দিতে পারি, তাহলেই কাজ হতে পারে– তাছাড়া এই গোল-টেবিল আলোচনা এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

অধ্যাপক ড. আবু সুফিয়ান– সাবেক অধ্যাপক, কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটি, এবং ইউনিভার্সিটি অব বাহরাইন: ড. আহমেদ তার প্রবন্ধে আমাদেরকে অবহিত করেছেন ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া সমাজের নৈতিক শিক্ষার অবক্ষয় রোধ করা যাবে না এবং বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া সমাজে ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিতিও হওয়া যাবে না। এই মডেল তিনি বইতেও লিখেছেন। এই মডেল সমাজে শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই মডেল সামাজিক উন্নয়নকে সাব্সটেনশিয়েট করবে যা হাইপোথিসিস টেস্টিং-এর সমজাতীয়। আমরা জানি ইসলাম একটা কমপ্লিট কোড অব লাইফ। সিলেবাসে কম্প্রিহেনসিভ সিস্টেম দরকার, অন্যথায় আমাদের ছেলেমেয়েরা ইসলাম সম্পর্কে স্থূল ধারণা নিয়ে বড় হবে। সমাজে দীনি শিক্ষা এবং নন-দীনি শিক্ষা বা বস্তুবাদী জগতের শিক্ষা বলে বিভাজন করে ধর্মটাকে সামগ্রীক শিক্ষা থেকে পৃথক করে ফেলা হচ্ছে। এই বিভাজন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে। মাদ্রাসাকে দীনি শিক্ষা বলে অভিহিত করছি। মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ফেলেছি। আসলে ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী বিজ্ঞান শিক্ষাকেও দীনি শিক্ষা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আমরা সেটাকে গণ্য করছিনে। আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা না থাকার কারণে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছি।

অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা: সামীম– অধ্যাপক, বাউবি: ড. আহমেদ তার মূল বইয়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ-শিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যা সুচারুরূপে চিহ্নিতকরণসহ যথাসম্ভব সমস্যা উত্তরণের পথ উন্মোচন করে দিয়েছেন। তিনি কওমি মাদ্রাসাসহ স্কুল কলেজ-মাদ্রাসার টেকনোলজির সুবিধা নেয়ার কথা বলেছেন– এটা খুবই যৌক্তিক। তিনি শিক্ষাঙ্গনের ম্যানেজিং কমিটি এবং ছাত্রদের অপরাজনীতির কথা বলেছেন– আমি এ বিষয়েও তার সাথে একমত। করোনাকালীন ব্লেন্ডেড লার্নিং চালু হয়ে গেছে। এতে ভবিষ্যতে এ ধরণের কোনো সমস্যায় ব্লেন্ডেড লার্নিং আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তিনি কারিগরি ও জীবনমুখী শিক্ষা নিয়ে কথা বলেছেন। আমরা যদি এশিয়ার সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার কথা বলি, তাদের উন্নতির মূল কারণগুলো যদি আমরা দেখি– কারিগরি শিক্ষাকেই তারা উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক হিসেবে নিয়েছে। আমরা সেটাকে সেভাবে নিতে পারিনি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে আমাদেরকে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার সম্বলিত কারিকুলাম ডেভেলপ করে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস।

জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন– প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস: লেখক তার প্রবন্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্ডস্ট্রিয়াল কোল্যাবরেশনের কথা সুন্দরভাবে বলেছেন, কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। বাংলাদেশের এগারো মিলিয়ন অদক্ষ লোক মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করে বছরে ষোলো বিলিয়ন ডলার দেশে নিয়ে আসে। আবার আনুমানিক আধা মিলিয়ন দক্ষ লোক এদেশে কাজ করে বছরে আট বিলিয়ন ডলার দেশে নিয়ে চলে যায়। আমরা যদি দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ না করি, এই বৈষম্য আরো বাড়বে। অশিক্ষিত লোকের তুলনায় শিক্ষিত লোক বেশি বেকার। সেজন্য শিক্ষাকে আমরা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছি তা দেখা দরকার। দেশে শিক্ষিত লোকেরা বেশি দুর্নীতির সাথে জড়িত। অশিক্ষিত লোকেরা দুর্নীতি করছেন না, অথবা সুযোগ পাচ্ছেন না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষায় বেশি বেকার সৃষ্টি করছে। একজন প্লাম্বার মিস্ত্রি পেতে তিন দিনের এ্যাপয়ন্টমেন্ট লাগে, অথচ একটা ফোন দিলেই দশ জন এমএ পাশ লোক পনেরো হাজার টাকা মাসিক বেতনে চাকরির জন্য হাজির হয়। সব শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষায় নিয়ে যাবার দরকার নেই। বিভিন্ন টায়ারে স্ক্রিনিং করে ফেলা দরকার। আদর্শলিপি-ধরনের লেখাপড়া, মৌলিক নৈতিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই উধাও হয়ে গেছে। ড. আহমেদ শিক্ষার জন্য অনেক মূল্যবান বিষয় আলোচনায় নিয়ে এসেছেন, সেগুলো দরকার। বাস্তবক্ষেত্রে জনসম্পদের সাপ্লাই-ডিমান্ডের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই, এটা দরকার।

অধ্যাপক ড. মোঃ রিজওয়ান খান– সাবেক উপাচার্য, ইউআইইউ: অধ্যাপক আহমেদ শিক্ষায় 'সেভেন আর'-এর কথা বলেছেন, এগুলো অনেক ভালো ভালো কথা। কিন্তু ক্লাসরুমের শিক্ষা ও সমাজ-জীবনের শিক্ষায় যে বৈপরীত্য– এতে একজন শিক্ষার্থী কোন শিক্ষাটাকে নেবে, আপনারা সহজেই তা অনুমান করতে পারেন। উনি তার বইতে যে সাজেশনগুলো দিয়েছেন, তার অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের দেশের বর্তমান এ অবস্থা কেন, যদি প্রশ্ন করেন, আমি শুধু মূল দুটো কারণকে চিহ্নিত করবো। প্রথমটা হচ্ছে দুর্নীতি এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে শিক্ষার রাজনীতিকরণ এবং নেতৃত্ব ও সদিচ্ছা। দুর্নীতি প্রতিটা ক্ষেত্রে রয়েছে। দুর্নীতি শুধু সমাজে নয়, শিক্ষক নিয়োগেও রয়েছে। সেক্ষেত্রে রাঁধুনি ভালো না হলে খাবার বিস্বাদ হবেই। সুতরাং এ দেশের রাজনীতিবিদরা যদি সচেতন না হন, আমরা কিছুই করতে পারবো না। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত শিক্ষা কমিশন কম হয়নি। কিংবা শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োগ করার আগে, প্রয়োগ করলে কি কি সমস্যা দেখা দেবে, তার রিমেডিয়াল মেজারস আগে থেকে নেয়া দরকার। সেগুলো নেয়া হয় না।

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান– কিউরেটর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্মৃতি যাদুঘর; এবং সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: ড.

আহমেদের বই এবং প্রেজেন্টেশন আমাকে অনেক চিন্তায় ফেলেছে। বইয়ের টাইটেল লেখায় বাঁকাচোরা দেখে বোঝা যায়, শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক চিন্তা ও দুশ্চিন্তা আছে। তার প্রবন্ধটা অনেকটা প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার দিকে সংগত কারণেই বেশি নজর দিয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কাদের উদ্দেশ্য নিয়ে করবো? এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ জনগোষ্ঠীমুখী ও কর্মমুখী হতে হবে। আমাদের শিক্ষা সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রিক। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কারিগরি শিক্ষামুখীও হওয়া দরকার। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের জন্য একটা সাধারণ প্রস্তুতি। এজন্য জীবনের দিকে নজর দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে সাজাতে হবে। এদেশের শিক্ষার পরিবর্তনের জন্য পলিটিক্যাল নেতাদের দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের শিক্ষাটা সার্ভিস অরিয়েন্টেড, এটাকে উৎপাদনমুখী করতে হবে।

অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলী– প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাউবি; প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি: অধ্যাপক ড. আহমেদের প্রতি সহানুভূতি হয় যে তিনি এতদিন ধরে চিন্তা করে, পরিশ্রম করে লেখনীর মাধ্যমে এক জায়গায় করলেন, কিন্তু লাভটা কি, যদি মানুষকে না জানানো যায়? কে কী বললো– এটা কোনো বিষয় না, আমরা দেশকে ভালোবাসি, দেশের জন্য উপকারী সব কিছুকেই বলতে হবে। লেখাগুলোকে এডিট করে যদি সংবাদ মাধ্যমে দিয়ে দেন, তারা সেটা প্রচার করবে। একটা সামারি তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দিন, তারা বিবেচনা করবে। এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা চালু আছে– তিনটাতে ডাইভার্সিটি থাকবে সত্য, কিন্তু প্রথম থেকেই না। এসএসসি পর্যায় পর্যন্ত এক থাকতে পারে। এ পর্যায় পর্যন্ত বেশ কয়েকটা কোর্স বাধতামূলক করে দেয়া যায়। সেটাকে অধ্যাপক হাসনান ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাপদ্ধতি বলেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষায়ও আগেকার সময়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ছিল। ইংরেজরা সেটা বিচ্যুৎ করেছে। ইংরেজরা কেরানি ও ধর্মযাজক তৈরি করলো। পৃথিবীর প্রতিটা দেশেই ধর্মশিক্ষা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে রি-অর্গানাইজ করা দরকার। মাদ্রাসার বিশাল একটা জনগোষ্ঠীকে অনুৎপাদনশীল রেখে জাতি গঠনে সম্পৃক্ত করতে না পারা উচিৎ নয়।

একটা পরিবার শিক্ষায় মূল্যবোধ, আচর-আচরণ, নৈতিকতা প্রাথমিক পর্যায়েই তৈরি করতে পারে। শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে গলে শিক্ষকরাই তা পারে। অন্য দেশের একজন শিক্ষকের চোখে চোখ রেখে আমাদের শিক্ষকরাও যদি বলতে পারে 'তুমি যা জানো, আমিও তার চেয়ে কম জানিনে', তাহলেই গুণগত শিক্ষা দেয়া সম্ভব। সরকার শিক্ষার জন্য শিক্ষা কমিশন তৈরি করতে পারে। কমিশন উপযুক্ত শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করবে এবং এই তৈরিকৃত তালিকা থেকে প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োগ করবে।

অধ্যাপক ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান– উপাচার্য, ইউআইইউ: সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন– আলোচনায় অনেকে অনেক কথা বলেছেন, আমি তাদের অল্প কিছু কথার উত্তর দিচ্ছি। কেউ কেউ বলেছেন যে আমাদের দেশের ভালো ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে চান না। এক্ষেত্রে সরকার পরোক্ষ কোনো সম্মান বা অনুপ্রেরণা শিক্ষকদের দিতে পারেন, যেমন– শিক্ষকদের আলাদা আইডি থাকতে পারে, যেটা ব্যবহার করে তারা ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ নিতে পারেন, তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ফি ছাড় পেতে পারেন ইত্যাদি। এদেশের বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় আনা দরকার। আমি জাপানেও দেখেছি যে, দ্বাদশ শেণি পর্যন্ত রিগারাস, একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা, মানের ক্ষেত্রে তেমন একটা পার্থক্য নাই। আমাদের দেশে পার্থক্যটা বেশি। আমরা যদি দশম শেণি পর্যন্ত খুব ভালোভাবে শিক্ষিত করতে পারি তাহলে উচ্চ-শিক্ষায় অসুবিধা হওয়ার কথা না।

এই কোভিডে ব্লেন্ডেড লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটা পর্যায়ে উন্নিত হয়েছি। সৃজনশীল পদ্ধতির অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে যে অভিযোগ এসেছে, সেক্ষেত্রে যে-কোনো পদ্ধতি প্রয়োগের আগে একটা পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে নিয়ে কার্যকারিতা দেখা যেতে পারে। টেকনিক্যাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনেকেই বলেছেন। সমাজের বিভিন্ন কাজে কর্মরত ব্যক্তিদের টেকনিক্যাল শিক্ষার সার্টিফিকেট নেয়া বাধ্যতামূলক করলেই তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমি কোল্যাবরেশনের কথা কেউ কেউ যথার্থই বলেছেন। এক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি থেকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ক্লাসে এনে শিক্ষার কাজে লাগানো যায়। সব কিছুর পিছনেই আসলে রাষ্ট্রীয় সুশাসন দরকার– একথা কেউ কেউ বলেছেন। এটা আসলেই দরকার। উচ্চ-শিক্ষায় বাংলার ব্যবহার দরকার। আমিও মনে করি উচ্চ-শিক্ষায় বাংলা থাকলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বিষয়গুলো আরো ভালো বুঝতে পারতো। ক্লাস টেন পর্যন্ত ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা অনেকেই বলেছেন– এর সাথে আমি একমত।

আমার যেটা মনে হয়, আমাদের কারিকুলাম খুব একটা খারাপ না। মুল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে গলদ আছে। আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা করতে পারার অভাব পরিলক্ষিত হয়। পড়ে চিন্তা করতে শেখাতে হবে। বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। আমাদের জিডিপির মাত্র ১.৫% শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়, যেটা ইউনেসকো প্রেসক্রাইব করে কমপক্ষে ৬%, এদিকে শিক্ষার প্রায়রিটি বাড়াতে হবে।

ড. মোঃ কামরুজ্জামান– পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এন্ড ইকোনোমিক রিসার্চ, ইউআইইউ: তিনি উপস্থিত সকল গুণিজন, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিককে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য এবং অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি অনুষ্ঠান আয়োজনের পিছনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং সেন্টার ও সেচ্ছাসেবকদেরকে ধন্যবাদ জানান। কারিগরি সহায়তার জন্য আইটি বিভাগকে ও সুন্দর মিডিয়া কভারেজের জন্য পাবলিক রিলেশনস বিভাগকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায়: অধ্যাপক **ড. ফরিদ এ. সোবহানি–** পরিচালক, এমবিএ, ইএমবিএ, এমআইএইচআরএম প্রোগ্রাম, ইউআইইউ।

মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপনায়: ***অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ***

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানঃ

ছবিতেঃ ডান থেকে অধ্যাপক ড. ফরিদ এ সোবহানী, অধ্যাপক ড. মো. সাদিকুল ইসলাম, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলী, অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দাম হোসেন, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম মিয়া, অধ্যাপক ড. মোঃ রিজওয়ান খান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মূসা এবং অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ।

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ– পরিচিতি

ড. হাসনান আহমেদের জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। তিনি একজন সুপরিচিত অ্যাকাডেমিশিয়ান। তাঁর অ্যাকাউন্টিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে বৈচিত্র্যময় অবদান ও ভূমিকা দেশ-বিদেশের অ্যাকাডেমিশিয়ানস ও পেশাজীবী সমাজে স্বীকৃত। তিনি দেশ-বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ, চার দশকের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাবিদ্যা এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি স্ট্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

তিনি একজন প্রাবন্ধিক, লেখক ও গল্পকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত স্কুল থেকে। তিনি সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সমাজব্যবস্থা ও বেপথুমান জীবনাচারের নিখুঁত ছবি অঙ্কনের একজন বলিষ্ঠ ভাষাশিল্পী। তাঁর লেখনীতে বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ধর্মীয় বিশৃখলা, জনসমাজের দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, শিক্ষামানের অবনতি প্রভৃতির বাস্তব ও মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি তাঁর লেখনীতে মানবসম্পদ উন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনার ছবি একজন উদারচেতা শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে এঁকেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও নিখাদ উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের বইয়ে। তাঁর লেখনী সমকালীন সমাজ-সংগঠনের গতিপ্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনবৈচিত্র্য, পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক বা আত্মমগ্ন উপাখ্যান।

ড. আহমেদ তেতাল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু এবং আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে অসংখ্য গবেষণায় এখনোও জড়িত। তিনি

আইসিএমএবি-র শিক্ষা ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এএসিএসবি স্বীকৃত মালয়েশিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া'র ভিজিটিং স্কলার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক্স-এর ডিন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সমাজসেবার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস-এর ট্রাস্টি-বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আইসিএমএবি-এর অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজরি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তিনি কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এতে তিনি অনন্য এক ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ করেন। সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন; দুঃস্থদের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি এদেশের সমাজ, দেশ ও শিক্ষার উন্নয়নে নতুন মডেল প্রতিষ্ঠা করেন, নতুন শিক্ষানীতি ও দেশ পরিচালনার নীতি ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধের রচয়িতা।

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সামাজিক শিক্ষা ও সামাজিক সেবার মানকেও উন্নত করতে হবে। সুশিক্ষিত পরিবেশ গড়তে গেলে

সমাজের অভ্যন্তর থেকে সুস্থ-চিন্তাশীল, কর্মোদ্যোগী লোককে একত্র করে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এ লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদদের সাথে নিয়ে ড. আহমেদ 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' গঠন করেন। এ পরিষদ এলাকাভিত্তিক 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' তৈরি করবে। এক্ষেত্রে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। এ প্ল্যাটফর্ম সরকারের শিক্ষা ও সমাজসেবা নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তুলতে গেলে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা প্রয়োজন। এই ত্রিমাত্রিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োগ করবে। এছাড়া সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ, সফ্টস্কিলস ট্রেইনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তা করবে। বণ্টনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করতে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' এবং 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে ড. আহমেদ 'শিক্ষা-সেবা (আর্থ-সামাজিক) উন্নয়ন মডেল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

বিভিন্নমুখী শিক্ষার সন্নিবেশ ও অভিজ্ঞতা ড. আহমেদকে অনন্য করেছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে

করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস '৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন।

ড. আহমেদ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– 'জীবনক্ষুধা', 'প্রতিদান চাইনি', 'কিছু কথা কিছু গান', 'অপেক্ষা', 'শেষবিকেলের পথরেখা', 'সত্যের গল্প গল্পের সত্য', 'সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম', 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা', 'এইসব দিনকাল', 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' অলখ মহাশক্তির খেলাঘর প্রভৃতি। তার শতাধিক প্রবন্ধ দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় (বিশেষত যুগান্তর পত্রিকায়) উপসম্পাদকীয় কলামে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।